গল্প

বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম

নিউ মার্কেটের কালীচরণের দোকান থেকে প্রতি সোমবার আপিস-ফেরতা বই কিনে বাড়ি ফেরেন বিপিন চৌধুরী। যতরাজ্যের ডিটেকটিভ বই, রহস্যের বই আর ভূতের গল্প। একসঙ্গে অন্তত খান পাঁচেক বই না কিনলে তাঁর এক সপ্তাহের খোরাক হয় না। বাড়িতে তিনি একা মানুষ। লোকের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর ধাতে আসে না, আড্ডার বাতিক নেই, বন্ধুপরিজনের সংখ্যাও কম। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেসব কাজের লোক আসেন, তাঁরা কাজের কথা সেরে উঠে চলে যান। যাঁরা ওঠেন না বা উঠতে চান না, বিপিনবাবু তাঁদের সোয়া আটটা বাজলেই বলেন—'আমার ডাক্তারের আদেশ আছে—সাড়ে আটটায় খাওয়া সারতে হবে। কিছু মনে করবেন না...'। খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর গল্পের বই হাতে নিয়ে সোজা বিছানায়। এই নিয়ম যে কতদিন ধরে চলেছে বিপিনবাবুর নিজেরই তার হিসেব নেই।

আজ কালীচরণের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিপিনবাবুর খেয়াল হল আরেকটি লোক যেন তাঁর পাশে কিছুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিপিনবাবু মুখ তুলে দেখেন একটি গোলগাল অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক তাঁরই দিকে চেয়ে হাসছেন।

'আমায় চিনতে পারছেন না বোধহয়?'

বিপিনবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। কই, এঁর সঙ্গে তো কোনোদিন আলাপ হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে না। এমন মুখও তো কোনো মনে পড়ছে না তাঁর।

'অবিশ্যি আপনি কাজের মানুষ। অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয় তো রোজ—তাই বোধহয়...'

'আমার কি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে এর আগে?' বিপিনবাবু জিজ্ঞেস

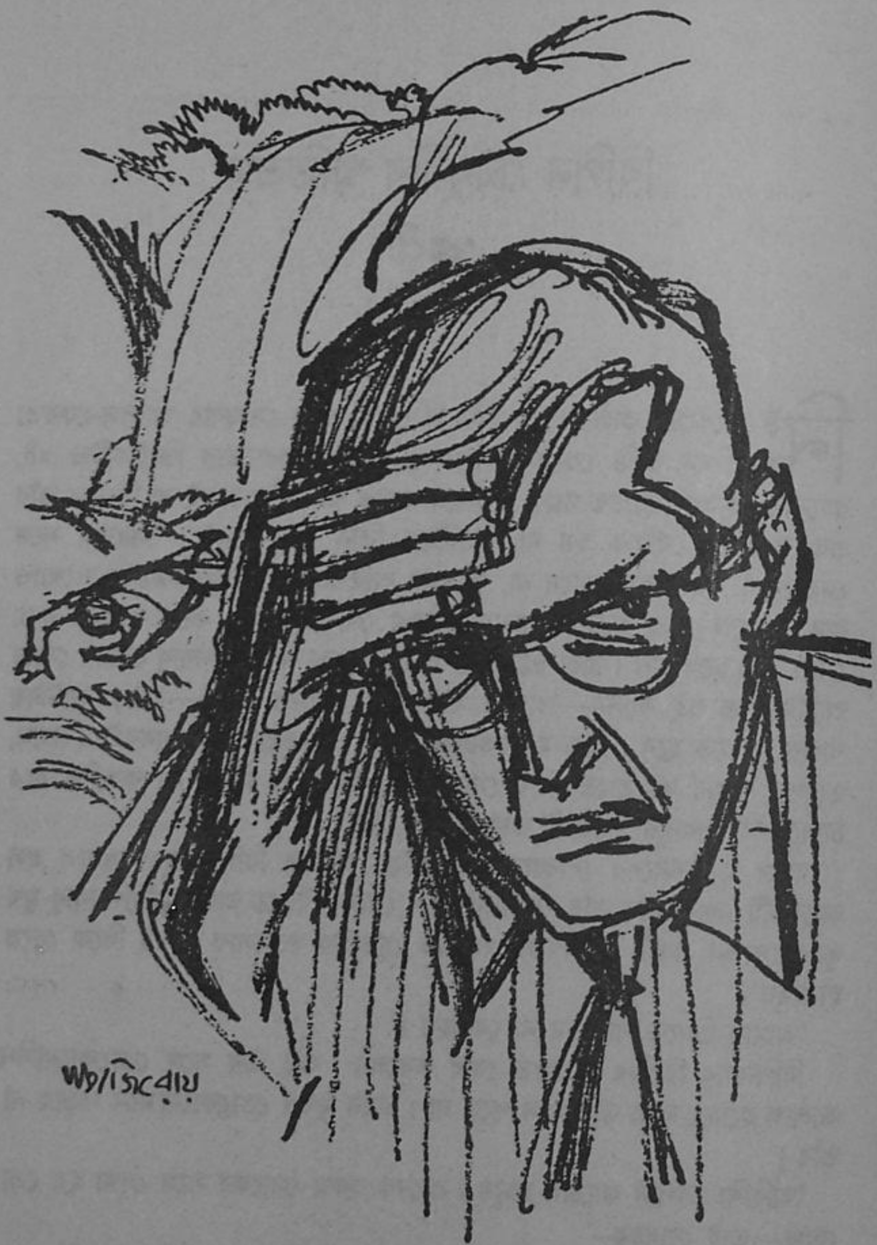

করলেন।

ভদ্রলোক যেন এবার একটু অবাক হয়েই বললেন, 'আজ্ঞে সাতদিন দু'বেলা সমানে দেখা হয়েছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলুম—সেই গাড়িতে আপনি হুড্রু ফল্‌স দেখতে গেলেন। সেই নাইনটিন ফিফ্‌টি-এইটে—রাঁচিতে! আমার নাম পরিমল ঘোষ।'

'রাঁচি?' বিপিনবাবু এবার বুঝলেন যে ভুল তাঁর হয়নি, হয়েছে এই লোকটিরই। কারণ বিপিনবাবু কোনোদিন রাঁচি যাননি। যাবার কথা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবার বিপিনবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমি কে তা আপনি জানেন কি?'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে জিভ কেটে বললেন, 'আপনি কে তা জানব না? বলেন কী? বিপিন চৌধুরীকে কে না জানে?'

বিপিনবাবু এবার বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু তাও আপনার ভুল হয়েছে। ওরকম হয় মাঝে মাঝে। আমি রাঁচি যাইনি কখনো।'

ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'কী বলছেন মিস্টার চৌধুরী? ঝরনা দেখতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে আপনার হাঁটু ছড়ে গেল। আমিই শেষটায় আয়োডিন এনে দিলুম। পরদিন নেতারহাট যাবার জন্যে আমি গাড়ি ঠিক করেছিলুম—আপনি পায়ের ব্যথার জন্যে যেতে পারলেন না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না? আপনার চেনা আরেকজন লোকও তো গেস্‌লেন সেবার—দীনেশ মুখুজ্যে। আপনি ছিলেন একটা বাংলো ভাড়া করে—বললেন হোটেলের খাবার আপনার ভালো লাগে না—তার চেয়ে বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়ে নেওয়া ভালো। দীনেশ মুখুজ্যে ছিলেন তাঁর বোনের বাড়িতে। আপনাদের দুজনের সেই তর্ক লেগেছিল একদিন চাঁদে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে—মনে নেই? সব ভুলে গেলেন? আরো বলছি—আপনার কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ ছিল—তাতে গল্পের বই থাকত। বাইরে গেলে নিয়ে যেতেন। কেমন—ঠিক কিনা?'

বিপিনবাবু এবার গম্ভীর সংযত গলায় বললেন, 'আপনি ফিফ্‌টি-এইটের কোন্‌ মাসের কথা বলছেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মহালয়ার ঠিক পরেই। হয় আশ্বিন, নয় কার্তিক।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। পুজোয় সে বছর আমি ছিলাম কানপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। আপনি ভুল করলেন। নমস্কার।'

কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন না। অবাক অপলক দৃষ্টিতে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য! একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনার বাংলোর দাওয়ায় বসে চা খেলুম। আপনি আপনার ফ্যামিলির কথা

বললেন—বললেন, আপনার ছেলেপিলে নেই, আপনার স্ত্রী বারো তেরো বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ভাই পাগল ছিলেন, তাই আপনি পাগলা গারদ দেখতে যেতে চাইলেন না। বললেন, ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়...'

বিপিনবাবু যখন বইয়ের দামটা দিয়ে দোকান থেকে বেরোচ্ছেন তখনও ভদ্রলোক তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

বারট্রাম স্ট্রীটে লাইটহাউস সিনেমার গায়ে বিপিন চৌধুরীর বুইক গাড়িটা লাগানো ছিল। তিনি গাড়িতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললেন, 'একটু গঙ্গার ধারটায় ঘুরে চলো তো সীতারাম।'

চলন্ত গাড়িতে বসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বিপিনবাবুর আপসোস হল। বাজে ভণ্ড লোকটাকে এতটা সময় কেন মিছিমিছি দিলেন তিনি! রাঁচি তো তিনি যাননি, কখনই যেতে পারেন না। মাত্র ছ' সাত বছর আগেকার স্মৃতি মানুষে অত সহজে ভুলতে পারে না, এক যদি না—

বিপিনবাবুর মাথা হঠাৎ বন করে ঘুরে গেল।

এক যদি না তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তাই বা হয় কী করে? তিনি তো দিব্যি আপিসে কাজ করে যাচ্ছেন। এত বিরাট আপিস—এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কোথাও তো কোনো ত্রুটি হচ্ছে বলে তিনি জানেন না। আজও তো একটা জরুরী মিটিং-এ আধঘণ্টার বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আশ্চর্য! অথচ—

অথচ লোকটা তাঁর এত খবর রাখল কী করে? এ যে একেবারে নাড়ীনক্ষত্র জেনে বসে আছে। বইয়ের ব্যাগ, স্ত্রীর মৃত্যু, ভাইয়ের মাথা খারাপ! ভুল করেছে কেবল ওই রাঁচির ব্যাপারে। ভুল কেন—জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আটান্ন সালের পুজোয় তিনি রাঁচি যাননি; গিয়েছিলেন কানপুরে, তাঁর বন্ধু হরিদাস বাগচির বাড়িতে। হরিদাসকে লিখলেই—নাঃ, হরিদাসকে লেখার উপায় নেই।

বিপিনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল হরিদাস বাগচি আজ মাসখানেক হল সস্ত্রীক জাপানে গেছেন তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে। জাপানের ঠিকানা বিপিনবাবু জানেন না। কাজেই চিঠি লিখে প্রমাণ আনানোর রাস্তা বন্ধ।

কিন্তু প্রমাণের প্রয়োজনটাই বা কোথায়। এমন যদি হত উনিশ শ আটান্ন সালের আশ্বিন মাসে রাঁচিতে কোনো খুনের জন্য পুলিশ তাঁকে দায়ী করার চেষ্টা করছে, তখনই তাঁর চিঠির প্রয়োজন হত হরিদাস বাগচির কাছ থেকে। এখন তো প্রমাণের কোনো দরকার নেই। তিনি নিজে জানেন তিনি রাঁচি যাননি। ব্যস্, ল্যাঠা চুকে গেল।

গঙ্গার হাওয়াতে বিপিন চৌধুরীর মাথা অনেক ঠাণ্ডা হলেও, মনের মধ্যে একটা খটকা, একটা অসোয়াস্তিবোধ যেন থেকেই গেল!

হেস্‌টিংস-এর কাছাকাছি এসে বিপিনবাবু তাঁর প্যান্টের কাপড়টা গুটিয়ে উপরে তুলে দেখলেন যে ডান হাঁটুতে একটা এক-ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ রয়েছে। সেটা কবেকার দাগ তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। ছেলেবেলা কি কখনও হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়েনি বিপিনবাবুর? অনেক চেষ্টা করেও সেটা তিনি মনে করতে পারলেন না।

চড়কডাঙার মোড়ের কাছাকাছি এসে তাঁর দীনেশ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। লোকটা বলছিল দীনেশ মুখুজ্যে ছিল রাঁচিতে ওই একই সময়ে। তাহলে দীনেশকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। সে থাকে কাছেই—বেণীনন্দন স্ট্রীট। এখনই যাবেন কি তার কাছে? কিন্তু যদি রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা মিথ্যেই হয়—তাহলে দীনেশকে সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তো সে বিপিনবাবুকে পাগল ঠাওরাবে। না না—এ ছেলেমানুষি তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সেধে সেধে এইভাবে বোকা বানানো কোনোমতেই চলতে পারে না। আর দীনেশের বিদ্রূপ যে কত নির্মম হতে পারে তার অভিজ্ঞতা বিপিনবাবুর আছে।...

বাড়ি এসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে বিপিনবাবুর উদ্বেগটা অনেক কম বলে মনে হল। যত সব বাউন্ডুলের দল! নিজেদের কাজকর্ম নেই, তাই কাজের লোকদের ধরে ধরে বিব্রত করা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে নতুন বইটা পড়তে পড়তে বিপিনবাবু নিউমার্কেটের ভদ্রলোকটির কথা ভুলেই গেলেন।

পরদিন আপিসে কাজ করতে করতে বিপিনবাবু লক্ষ করলেন যে, যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন গতকালের ঘটনাটা তাঁর স্মৃতিতে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই গোলগাল মুখ, সেই ঢুলুঢুলু অমায়িক চাহনি, আর সেই হাসি। তাঁর এত ভেতরের খবরই যদি লোকটা নির্ভুল জেনে থাকে, তবে রাঁচির ব্যাপারটায় সে এত ভুল করল কী করে?

লাঞ্চের ঠিক আগে—অর্থাৎ একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়—বিপিনবাবু আর থাকতে না পেরে টেলিফোনের ডিরেক্টরিটা খুলে বসলেন। দীনেশ মুখুজ্যেকে ফোন করতে হবে একটা। ফোনই ভালো। অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনাটা কম।

টু-থ্রি-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স।

বিপিনবাবু ডায়াল করলেন।

'হ্যালো।'

'কে, দীনেশ? আমি বিপিন কথা বলছি।'

'কী খবর?'

'ইয়ে ফিফ্‌টি এইটের একটা ঘটনা তোমার মনে আছে কিনা জানবার জন্য ফোন করছি।'

'ফিফ্‌টি এইট ? কী ঘটনা ?'

'সে বছরটা কি তুমি কলকাতাতেই ছিলে ? আগে সেইটে আমার জানা দরকার।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। ফিফ্‌টি এইট—আটান্ন···দাঁড়াও, আমার ডায়েরি দেখি। একটু ধরো '

একটুক্ষণ চুপচাপ। বিপিনবাবু তাঁর বুকের ভেতরে একটা দুরুদুরু কাঁপুনি অনুভব করলেন। প্রায় এক মিনিট পরে আবার দীনেশ মুখুজ্যের গলা পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমি বাইরে গেস্‌লাম—দু'বার।'

'কোথায় ?'

'একবার গেস্‌লাম ফেব্রুয়ারিতে—কাছেই—কেষ্টনগর—আমার এক ভাগনের বিয়েতে। আরেকবার—ও, এটা তো তুমি জানই। সেই রাঁচি। সেই যে যেবার তুমিও গেলে। ব্যস্‌। কিন্তু কেন বলো তো ?'

'না। একটা দরকার ছিল। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ···'

বিপিনবাবু টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছে, হাত পা যেন সব কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সঙ্গে টিফিনের বাক্সে স্যান্ডউইচ ছিল, সেটা আর তিনি খেলেন না। খাবারকোনো ইচ্ছেই হল না। তাঁর খিদে চলে গেছে।

লাঞ্চ টাইম শেষ হয়ে যাবার পর বিপিনবাবু বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে আপিসে বসে কাজ করা অসম্ভব। তাঁর পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে এর আগে এরকম কখনো হয়নি। নিরলস কর্মী বলে বিপিনবাবুর একটা খ্যাতি ছিল। কর্মচারীরা তাঁকে বাঘের মতো ভয় করত। যত বিপদই আসুক, যত বড় সমস্যারই সামনে পড়তে হোক, বিপিনবাবুর কোনোদিন মতিভ্রম হয়নি। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে সব সময়ে সব বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

আজ কিন্তু তাঁর সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে!

আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরে, শোবার ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে মনটাকে প্রকৃতিস্থ করে, কী করা উচিত সেটা ভাববার চেষ্টা করলেন বিপিনবাবু। মানুষ মাথায় চোট খেয়ে বা অন্য কোনোরকম অ্যাকসিডেন্টের ফলে মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আর সব মনে আছে, শুধু একটা বিশেষ ঘটনা মনে নেই—এর কোনো উদাহরণ তিনি আর কখনো পাননি। রাঁচি যাবার ইচ্ছে তাঁর অনেকদিন থেকেই ছিল। সেই রাঁচিই

গেছেন, অথচ গিয়ে ভুলে গেলেন, এ একেবারে অসম্ভব।

বাইরে কোথাও গেলে বিপিনবাবু তাঁর বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু এখন যে বেয়ারাটা আছে সে নতুন লোক। সাত বছর আগে তাঁর বেয়ারা ছিল রামস্বরূপ। তিনি রাঁচি গিয়ে থাকলে সেও নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু এখন সে আর নেই, তিন বছর হল নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপিনবাবু একাই কাটালেন তাঁর ঘরে। মনে মনে স্থির করলেন আজ কেউ এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

সাতটা নাগাদ চাকর এসে খবর দিল তাঁর সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী শেঠ গিরিধারীপ্রসাদ দেখা করতে এসেছেন। জাঁদরেল লোক গিরিধারীপ্রসাদ। কিন্তু বিপিনবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমনই যে তিনি বাধ্য হয়ে চাকরকে বলে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে নিচে নামা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক গিরিধারীপ্রসাদ!

সাড়ে সাতটায় আবার চাকরের আগমন। বিপিনবাবুর তখন সবে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, একটা দুঃস্বপ্নের গোড়াটা শুরু হয়েছে, এমন সময় চাকরের ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আবার কে এল ? চাকর বলল, 'চুনিবাবু! বলছে ভীষণ জরুরী দরকার।'

দরকার যে কী তা বিপিনবাবু জানেন। চুনি তাঁর স্কুলের সহপাঠী। সম্প্রতি দুরবস্থায় পড়েছে, ক'দিন থেকেই তাঁর কাছে আসছে একটা কোনো চাকরির আশায়। বিপিনবাবুর পক্ষে তার জন্যে কিছু করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিবারই তিনি তাকে না বলে দিয়েছেন, আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো চুনি!

বিপিনবাবু অত্যন্ত বিরক্তভাবে চাকরটাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, শুধু আজ নয়—বেশ কিছুদিন তাঁর পক্ষে চুনির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।

চাকর ঘর থেকে চলে যেতেই বিপিনবাবুর খেয়াল হল যে চুনির হয়তো আটান্নর ঘটনা কিছুটা মনে থাকতে পারে। তাকে একবার জিজ্ঞেস করাতে দোষ কী ?

বিপিনবাবু তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় হাজির হলেন। চুনি যাবার জন্যে উঠে পড়েছিল, বিপিনবাবুকে নেমে আসতে দেখে সে যেন একটু আশান্বিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু ভণিতা না করেই বললেন, 'শোনো চুনি, তোমার কাছে একটা—মানে, একটু বেখাপ্পা প্রশ্ন আছে। তোমার তো স্মরণশক্তি বেশ ভালো ছিল বলে জানি—আর আমার বাড়িতে তো তুমি অনেক বছর ধরেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করছ। ভেবে দেখো তো মনে পড়ে কিনা—আমি কি আটান্ন সালে রাঁচি গিয়েছিলাম ?'

চুনি বলল, 'আটান্ন ? আটান্নই তে হবে। নাকি ঊনষাট ?'

'রাঁচি যাওয়াটা নিয়ে তোমার কোনো সন্দেহ নেই ?'

চুনি এবার রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

'তোমার কি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে ?'

'আমি গিয়েছিলাম ? তোমার ঠিক মনে আছে ?'

চুনি সোফা থেকে উঠেছিল, সেটাতেই আবার বসে পড়ল। তারপর সে বিপিন চৌধুরীর দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'বিপিন, তুমি কি নেশাটেশা ধরেছ নাকি আজকাল ? এদিকে তো তোমার কোনো বদনাম ছিল না ! তুমি কড়া মেজাজের লোক, পুরানো বন্ধুদের প্রতি তোমার সহানুভূতি নেই—এসবই তো জানতুম ! কিন্তু তোমার তো মাথাটা পরিষ্কার ছিল ; অন্তত কিছুদিন আগে অবধি ছিল !'

বিপিনবাবু কম্পিতস্বরে বললেন, 'তোমার মনে আছে আমার যাবার কথা ?'

চুনি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল। সে বলল—

'আমার শেষ চাকরি কী ছিল মনে আছে তোমার ?'

'বিলক্ষণ। তুমি হাওড়া স্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলে।'

'তোমার সেটা মনে আছে, আর আমিই যে তোমার রাঁচির বুকিং করে দিলাম সেটা মনে নেই ? তোমার যাবার দিন তোমার কামরায় গিয়ে দেখা করলাম, ডাইনিং কারে বলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম, তোমার কামরায় পাখা চলছিল না—সেটা লোক ডেকে চালু করে দিলাম—এসব তুমি ভুলে গেছ ? তোমার হয়েছে কী ?'

বিপিনবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন।

চুনি বলল, 'তোমার কি অসুখ করেছে ? তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখছি না।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তাই মনে হচ্ছে। ক'দিন কাজের চাপটা একটু বেশি পড়েছিল। দেখি একটা স্পেশালিস্ট-টেশালিস্ট...'

বিপিনবাবুর অবস্থা দেখেই বোধহয় চুনি আর চাকরির উল্লেখ না করে আস্তে আস্তে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

পরেশ চন্দ্রকে ইয়াং ডাক্তার বলা চলে, চল্লিশের নিচে বয়স, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিপিনবাবুর ব্যাপার শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিপিনবাবু তাঁকে মরিয়া হয়ে বললেন, 'দেখুন ডক্টর চন্দ্র, আমার এ ব্যারাম আপনাকে সারিয়ে দিতেই হবে। আপিস কামাই করার ফলে যে কী ক্ষতি হচ্ছে আমার ব্যবসার তা আমি বোঝাতে পারব না। আজকাল তো অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। আমার এ ব্যারামের জন্য কি কিছুই নেই ? আমি যত টাকা লাগে দেব। যদি বিদেশ থেকে

আনাবার দরকার হয় তারও ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ রোগ আপনাকে সারাতেই হবে।'

ডাক্তার একটু ভেবেচিন্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিস্টার চৌধুরী ? আমার কাছে এ রোগ একেবারে নতুন জিনিস ; আমার অভিজ্ঞতার একেবারে বাইরে। তবে একটা মাত্র উপায় আমি বলতে পারি। ফল হবে কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই।'

বিপিনবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।

ডাক্তার বললেন, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে—এবং আমার বিশ্বাস আপনারও এখন তাই ধারণা—যে আপনি সত্যিই রাঁচি গিয়েছিলেন, কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, এই যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন। আমি সাজেস্ট করছি যে আপনি আরেকবার রাঁচি যান। তাহলে হয়তো জায়গাটা দেখে আপনার আগের ট্রিপ-এর কথাটা মনে পড়ে যাবে। এটা অসম্ভব নয়। আজ এই মুহূর্তে তো বেশি কিছু করা সম্ভব নয় ! আমি আপনাকে একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি—সেটা খেলে হয়তো ঘুমটা হবে। ঘুমটা দরকার, তা নাহলে আপনার অশান্তি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অসুখও বেড়ে যাবে। আপনি একটা কাগজ দিন, আমি ওষুধটা লিখে দিচ্ছি।'

বড়ির জন্যেই হোক, বা ডাক্তারের পরামর্শের জন্যেই হোক, বিপিনবাবু পরদিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করলেন।

প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে আপিসে টেলিফোন করে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেইদিনই রাত্রের জন্য রাঁচির টিকিট কিনলেন।

পরদিন রাঁচি স্টেশনে নেমেই তিনি বুঝলেন এ জায়গায় তিনি কস্মিনকালেও আসেননি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি করে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বুঝলেন যে এখানের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মোরাবাদি পাহাড়, হোটেল, বাংলো, কোনোটার সঙ্গেই তাঁর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। হুড্রু ফল্‌স কি তিনি চিনতে পারবেন ? জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখলেই কি তাঁর পুরানো কথা সব মনে পড়ে যাবে ?

নিজে সে কথা বিশ্বাস না করলেও, পাছে কলকাতায় ফিরে অনুতাপ হয় তাই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দুপুরের দিকে হুড্রুর দিকে রওনা দিলেন।

সেইদিনই বিকেল পাঁচটার সময় হুড্রুতে একটি পিকনিকের দলের দুটি গুজরাটি ভদ্রলোক বিপিনবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি পাথরের ঢিপির পাশে আবিষ্কার করল। এই দুই ভদ্রলোকের শুশ্রূষার ফলে জ্ঞান ফিরে পেতেই বিপিনবাবু প্রথম কথা বললেন—'আমি রাঁচি আসিনি। আমার সব গেল ! আর

কোনো আশা নেই…'

পরদিন সকালে বিপিন চৌধুরী কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে যদি না তিনি এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারেন, তবে তাঁর আর সত্যই কোনো আশা নেই। তাঁর কর্মক্ষমতা, তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর উৎসাহ, বুদ্ধি বিবেচনা সবই তিনি ক্রমে ক্রমে হারাবেন। শেষে কি তাহলে তাঁকে সেই রাঁচির… ?

এর পরে আর বিপিনবাবু ভাবতে পারেন না, ভাবতে চান না।…

বাড়ি ফিরে কোনোরকমে স্নান করে মাথায় বরফের থলি চাপা দিয়ে বিপিন চৌধুরী শয্যা নিলেন। চাকরকে বললেন ডাক্তার চন্দ্রকে ডেকে নিয়ে আসতে। চাকর যাবার আগে তাঁর হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলল, 'কে জানি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। সবুজ খাম, তার উপর লাল কালিতে লেখা—'শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী। জরুরী, একান্ত ব্যক্তিগত।'

অসুস্থতা সত্ত্বেও বিপিনবাবুর কেন জানি মনে হল যে চিঠিটা তাঁর পড়া দরকার। খাম খুলে দেখেন এই চিঠি—

'প্রিয় বিপিন,

হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কুফল যে তোমার মধ্যে এভাবে দেখতে পাব তা আশা করিনি। একজন দুঃস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দেওয়া কি সত্যিই তোমার পক্ষে এত অসম্ভব ছিল ? আমার টাকা নেই, তাই ক্ষমতা সামান্যই। যে জিনিসটা আছে আমার সেটা হল কল্পনাশক্তি। তারই সামান্য কিছুটা খরচ করে তোমার উপর সামান্য প্রতিশোধ নিলাম।

নিউ মার্কেটের সেই ভদ্রলোকটি আমার প্রতিবেশী ; বেশ ভালো অভিনেতা। দীনেশ মুখুজ্যে তোমার প্রতি সদয় নন, তাই তাকে হাত করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। হাঁটুর দাগটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই চাঁদপাল ঘাটে আছাড় খাওয়া—উনিশ শ ছত্রিশ সনে ?…

আর কী ? এবার সেরে উঠবে। আমার একটি উপন্যাস এক প্রকাশকের পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা মাস তাতেই কোনোরকমে চালিয়ে নেব। ইতি

তোমার বন্ধু চুনিলাল'

ডাক্তার চন্দ্র আসতেই বিপিনবাবু বললেন, 'ভালো আছি। রাঁচি স্টেশনে নেমেই সব মনে পড়ে গেল।'

ডাক্তার বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ ! আপনার কেসটা একটা ডাক্তারি জার্নালে ছাপিয়ে দেব ভাবছি।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আপনাকে যেই জন্য ডাকা—দেখুন তো, আমার কোমরের হাড়টাড় ভাঙল কিনা। রাঁচিতে হোঁচট খেয়েছিলাম। টনটন করছে।'

পটলবাবু ফিল্ম স্টার

পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরে থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন, 'পটল আছ নাকি হে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়ান, আসছি।'

নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানা বাড়ির পরেই থাকেন। বেশ আমুদে লোক।

পটলবাবু থলে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার ? সক্কাল-সক্কাল ?'

'শোনো, তুমি ফিরছ কতক্ষণে ?'

'এই ঘণ্টাখানেক। কেন ?'

'তারপর আর বেরোনোর ব্যাপার নেই তো ? আজ তো ট্যাগোর্স বার্থডে। আমার ছোটশালার সঙ্গে কাল নেতাজী ফার্মেসিতে দেখা হল। সে ফিল্মে কাজ করে—লোকজন জোগাড় করে দেয়। বললে কী জানি একটা ছবির একটা সীনের জন্য একজন লোকের দরকার। যেরকম চাইছে, বুঝেছ—বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক—আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তোমার হদিস দিয়ে দিলুম। বলেছি সোজা তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে। আজ সকালে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। তোমার আপত্তি নেই তো ? ওদের রেট হিসেবে কিছু পেমেন্টও দেবে অবিশ্যি…'

সক্কালবেলা ঠিক এই ধরনের একটা খবর পটলবাবু আশাই করেননি। বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা তাঁর মতো নগণ্য লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন বৈকি। এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার !

'কী হে, হ্যাঁ কি না বলে ফেলো। তুমি তো অভিনয়-টভিনয় করেছ এককালে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, মানে, 'না' বলার আর কী আছে ? সে আসুক, কথাটথা বলে দেখি ! কী

নাম বললেন আপনার শালার ?'

'নরেশ । নরেশ দত্ত । বছর ত্রিশেক বয়স লম্বা দোহারা চেহারা । দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে ।'

বাজার করতে গিয়ে আজ পটলবাবু গিন্নীর ফরমাশ গুলিয়ে ফেলে কালোজিরের বদলে ধানিলঙ্কা কিনে ফেললেন । আর সৈন্ধব নুনের কথাটা তো বেমালুম ভুলেই গেলেন । এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই । এককালে পটলবাবুর রীতিমত অভিনয়ের শখ ছিল । শুধু শখ কেন—নেশাই বলা চলে । যাত্রায়, শখের থিয়েটারে, পুজোপার্বণে পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা কাজ ছিল অভিনয় করা । হ্যান্ডবিলে কতবার নাম উঠেছে পটলবাবুর । একবার তো নিচের দিকে আলাদা করে বড় অক্ষরে নাম বেরুল তাঁর—"পরাশরের ভূমিকায় শ্রীশীতলাকান্ত রায় (পটলবাবু) ।" তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশি, এমনও সময় গেছে এককালে ।

তখন অবিশ্যি তিনি থাকতেন কাঁচরাপাড়ায় । সেখানেই রেলের কারখানায় চাকরি ছিল তাঁর । উনিশ শ চৌত্রিশ সনে কলকাতার হাডসন অ্যান্ড কিম্বার্লি কোম্পানিতে আরেকটু বেশি মাইনের একটা চাকরি, আর নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে এই বাড়িটা পেয়ে পটলবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন । ক'টা বছর কেটেছিল ভালোই । আপিসের সাহেব বেশ স্নেহ করতেন পটলবাবুকে । তেতাল্লিশ সনে পটলবাবু সবে একটা পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ব-গড়ব করছেন এমন সময় যুদ্ধের ফলে আপিসে হল ছাঁটাই, আর পটলবাবুর ন' বছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল ।

সেই থেকে আজ অবধি বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দায় কেটে গেছে পটলবাবুর । গোড়ায় একটা মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন, সেটা বছর পাঁচেক চলে উঠে যায় । তারপর একটা বাঙালী আপিসে কেরানিগরি করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বড়কর্তা বাঙালী সাহেব মিস্টার মিটারের ঔদ্ধত্য আর অকারণ চোখ-রাঙানি সহ্য করতে না পারায় নিজেই ছেড়ে দেন সে চাকরি । তারপর এই দশটা বছর ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে শুরু করে কী-না করেছেন, পটলবাবু ! কিন্তু যে-অভাব, যে টানাটানি, সে আর দূর হয়নি কিছুতেই । সম্প্রতি তিনি একটা লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন ; তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বলেছে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে দেবে ।

আর অভিনয় ? সে তো যেন আর-এক জন্মের কথা ! অজান্তে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবছা আবছা মনে পড়ে যায়, এই আর কি । নেহাত পটলবাবুর স্মরণশক্তি ভালো, তাই কিছু ভালো ভালো পার্টের ভালো ভালো অংশ এখনো মনে আছে !—'শুন পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবঝঙ্কার, স্বপক্ষ আকুল মহারণে । জিনি শত

পবন-হুঙ্কার, পর্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার— বৃকোদর সঞ্চালনে !'...ওঃ ! ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে !

নরেশ দত্ত এলেন ঠিক সাড়ে-বারোটার সময়। পটলবাবু প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে নাইতে যাবার তোড়জোড় করছিলেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন, আসুন !' পটলবাবু দরজা খুলে আগন্তুককে প্রায় ঘরের ভিতর টেনে এনে তাঁর হাতলভাঙা চেয়ারটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন—'বসুন !'

'না, না। বসব না। নিশিকান্তবাবু আপনাকে আমার কথা বলেছেন বোধহয়...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি খুবই অবাক হয়েছি। এতদিন বাদে...'

'আপনার আপত্তি নেই তো ?'

পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আমাকে দিয়ে...হেঁ হেঁ...মানে চলবে তো ?'

নরেশবাবু গম্ভীরভাবে একবার পটলবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'বেশ চলবে। খুব চলবে। কাজটা কিন্তু কালই।'

'কাল ? রবিবার ?'

'হ্যাঁ কোনোস্টুডিওতে নয় কিন্তু। জায়গাটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মিশন রো আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ের ফ্যারাডে হাউসটা দেখেছেন তো ? সাততলা বিল্ডিং একটা ? সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন। ওইখানেই কাজ। বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে আপনার।'

নরেশবাবু উঠে পড়লেন। পটলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু পার্টটা কী বললেন না ?'

পার্ট হল গিয়ে আপনার...একজন পেডেস্ট্রিয়ানের, মানে পথচারী আর কি ! একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজী পেডেস্ট্রিয়ান।...ভালো কথা, আপনার গলাবন্ধ কোট আছে কি ?'

'তা আছে বোধহয়।'

'ওটাই পরে আসবেন। ডার্ক রঙ তো ?'

'বাদামী গোছের। গরম কিন্তু।'

'তা হোক না। আর আমাদের সীনটাও শীতকালের, ভালোই হবে...কাল সাড়ে-আটটা, ফ্যারাডে হাউস !'

পটলবাবুর ধাঁ করে আরেকটা জরুরী প্রশ্ন মাথায় এসে গেল।

পার্টটায় ডায়ালগ আছে তো ? কথা বলতে হবে তো ?'

'আলবত ! স্পীকিং পার্ট !...আপনি আগে অভিনয় করেছেন তো ?'

'হ্যাঁ...তা, একটু-আধটু...

'তবে ! শুধু হেঁটে যাবার জন্য আপনার কাছে আসব কেন ? সে তো রাস্তা

থেকে যে-কোনো একটা পেডেস্ট্রিয়ান ধরে নিলেই হল !...ডায়ালগ আছে বৈকি এবং সেটা কাল ওখানে গেলেই পেয়ে যাবেন। আমি...'

নরেশ দত্ত চলে যাবার পর পটলবাবু তাঁর গিন্নীর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'যা বুঝছি—বুঝলে গিন্নী—এ পার্টটা হয়ত তেমন একটা বড় কিছু নয় ; অর্থপ্রাপ্তি অবিশ্যি আছে সামান্য, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, থিয়েটারে আমার প্রথম পার্ট কী ছিল মনে আছে তো ? মৃত সৈনিকের পার্ট। স্রেফ হাঁ করে চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা ; আর তার থেকেই আস্তে আস্তে কোথায় উঠেছিলাম মনে আছে তো ? ওয়াট্স্ সাহেবের হ্যান্ডশেক মনে আছে ? আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারু বিশ্বাসের দেওয়া সেই মেডেল ? অ্যাঁ ? এ তো সবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ ! কী বল অ্যাঁ ? মান যশ প্রতিপত্তি খ্যাতি, যদি বেঁচে থাকি ভবে, হে মোর গৃহিণী, এ সবই লভিব আমি !...'

পটলবাবু বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। গিন্নী বললেন, 'কর কী ?'

'কিচ্ছু ভেবো না গিন্নী। শিশির ভাদুড়ী সত্তর বছর বয়সে চাণক্যের পার্টে কী লাফখানা দিতেন মনে আছে ? আজ যে পুনর্যৌবন লাভ করেছি !'

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল ! সাধে কি তোমার কোনো দিন কিচ্ছু হয় না ?'

'হবে হবে ! সব হবে ! ভালো কথা—আজ বিকেলে একটু চা খাব, বুঝেছ ? আর সঙ্গে একটু আদার রস, নইলে গলাটা ঠিক...'

পরদিন সকালে মেট্রোপোলিটান কোম্পানির ঘড়িতে যখন আটটা বেজে সাত মিনিট তখন পটলবাবু এস্প্ল্যানেডে এসে পৌঁছোলেন। সেখান থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ও মিশন রো-র মোড়ে ফ্যারাডে হাউসে পৌঁছতে লাগল আরো মিনিট দশেক।

বিরাট তোড়জোড় চলেছে আপিসের গেটের সামনে। তিন-চারখানা গাড়ি, তার একটা বেশ বড়ো—প্রায় বাস-এর মতো—তার মাথায় আবার সব জিনিসপত্তর। রাস্তার ঠিক ধারটায় ফুটপাথের উপর একটা তেপায়া কালো যন্ত্রের মতো জিনিস ; তার পাশে কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। গেটের ঠিক মুখটাতে একটা তেপায়া লোহার ডাণ্ডার মাথায় আরেকটা লোহার ডাণ্ডা আড়াআড়িভাবে শোয়ানো রয়েছে, আর তার ডগা থেকে ঝুলছে একটা মৌমাছির চাকের মতো দেখতে জিনিস এ ছাড়া ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জনা ত্রিশেক লোক, যাদের মধ্যে অবাঙালীও লক্ষ করলেন পটলবাবু ; কিন্তু এদের যে

কী কাজ সেটা ঠাহর করতে পারলেন না।

কিন্তু নরেশবাবু কোথায় ? একমাত্র তিনি ছাড়া তো পটলবাবুকে কেউই চেনেন না।

দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

বৈশাখ মাস ; গলাবন্ধ খদ্দরের কোটটা গায়ে বেশ ভারী বোধ হচ্ছিল। গলায় কলারের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু ঘাম অনুভব করলেন পটলবাবু।

'এই যে অতুলবাবু—এদিকে !'

অতুলবাবু ? পটলবাবু ঘুরে দেখেন আপিসের বারান্দায় একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু তাঁকেই ডাকছেন। নামটা ভুল করেছেন ভদ্রলোক। অস্বাভাবিক নয়। একদিনের আলাপ তো ! পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নামটা বোধহয় ঠিক নোট করা নেই আপনার। শ্রীশীতলাকান্ত রায়। অবিশ্যি পটলবাবু বলেই জানে সকলে। থিয়েটারেও ওই নামেই জানত।'

'ও ! তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।'

পটলবাবু মৃদু হাসলেন।

'ন' বছর হাডসন কিম্বার্লিতে চাকরি করেছি ; লেট হইনি একদিনও। নট এ সিঙ্গল্ ডে।'

'বেশ, বেশ। আপনি এক কাজ করুন। ওই ছায়াটায় গিয়ে একটু ওয়েট করুন। আমরা এদিকে একটু কাজ এগিয়ে নিই।'

তেপায়া যন্ত্রটার পাশ থেকে একজন ডেকে উঠল, 'নরেশ !'

'স্যার ?'

'উনি কি আমাদের লোক ?'

'হ্যাঁ স্যার। ইনিই... মানে, ওই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

'ও। ঠিক আছে। এখন জায়গাটা ক্লিয়ার করো তো ; শট্ নেব।'

পটলবাবু আপিসের পাশেই একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বায়স্কোপ তোলা তিনি এর আগে কখনো দেখেননি। তাঁর কাছে সবই নতুন। থিয়েটারের সঙ্গে কোনো মিলই তো নেই ! আর কী পরিশ্রম করে লোকগুলো। ওই ভারী যন্ত্রটাকে পিঠে করে নিয়ে এখান থেকে ওখানে রাখছে একটি একুশ-বাইশ বছরের ছোকরা। বিশ-পঁচিশ সের ওজন তো হবেই যন্ত্রটার।

কিন্তু তাঁর ডায়ালগ কই ? আর তো সময় নেই বেশি। অথচ এখনো তাঁকে যে কী কথা বলতে হবে তাই জানেন না পটলবাবু।

হঠাৎ যেন একটু নার্ভাস বোধ করলেন পটলবাবু। এগিয়ে যাবেন নাকি ? ওই তো নরেশবাবু ; একবার তাঁকে গিয়ে বলা উচিত নয় কি ? পার্ট ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ভালো করে করতে হলে তাঁকে তো তৈরি করতে হবে সে পার্ট ! নাহলে এতগুলো লোকের সামনে তাঁকে যদি কথা গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হতে হয় ? আজ প্রায় বিশ বচ্ছর অভিনয় করা হয়নি যে !

পটলবাবু এগিয়ে যেতে গিয়ে একটা চিৎকার শুনে চমকে থেমে গেলেন।

'সাইলেন্স !'

তারপর নরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল—'এবার শট্ নেওয়া হবে ! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন। কথাবার্তা বলবেন না, জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবেন না !'

তারপর আবার সেই প্রথম গলায় চিৎকার এল—'সাইলেন্স ! টেকিং !' এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন। মাঝারি গোছের মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তেপায়া যন্ত্রটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ; গলার একটা চেন থেকে দূরবীনের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইনিই কি পরিচালক নাকি ? কী আশ্চর্য, পরিচালকের নামটাও যে তাঁর জেনে নেওয়া হয়নি !

এবারে পর পর আরো কতগুলো চিৎকার পটলবাবুর কানে এল—'স্টার্ট সাউন্ড !' 'রানিং !' 'অ্যাকশন !'

অ্যাকশন কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই পটলবাবু দেখলেন চৌমাথার কাছ থেকে একটা গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল, আর তার থেকে একটি মুখে-গোলাপী-রং-মাখা স্যুট-পরা যুবক দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে হনহনিয়ে আপিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই পটলবাবু চিৎকার শুনলেন 'কাট', আর অমনি সাইলেন্স ভেঙে গিয়ে জনতার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

পটলবাবুর পাশেই এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছোকরাটিকে চিনলেন তো ?'

পটলবাবু বললেন, 'কই, না তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'চঞ্চলকুমার। তরতরিয়ে উঠছে ছোকরা। একসঙ্গে চারখানা বইয়ে অভিনয় করছে।'

পটলবাবু বায়স্কোপ খুবই কম দেখেন, কিন্তু এই চঞ্চলকুমারের নাম যেন শুনেছেন দু-একবার। কটিবাবু বোধহয় এই ছেলেটিরই প্রশংসা করছিলেন একদিন। বেশ মেক-আপ করেছে ছেলেটি। ওই বিলিতি স্যুটের বদলে ধুতি চাদর পরিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়িয়ে দিলেই একেবারে কার্তিক ঠাকুর। কাঁচড়াপাড়ার মনোতোষ ওরফে চিনুর চেহারা কতকটা ওইরকমই ছিল বটে ; বেড়ে ফীমেল পার্ট করত চিনু !

পটলবাবু এবার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আর পরিচালকটির নাম কী মশাই ?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি তাও জানেন না ? উনি যে বরেন মল্লিক—তিনখানা ছবি পর পর হিট করেছে !'

যাক। কতগুলো দরকারী জিনিস জানা হয়ে গেল। নইলে গিন্নী যদি জিজ্ঞেস করতেন কার ছবিতে কার সঙ্গে অভিনয় করে এলে, তাহলে মুশকিলেই পড়তেন পটলবাবু।

নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন স্যার, গলাটা একটু ভিজিয়ে আলগা করে নিন। আপনার ডাক পড়ল বলে !'

পটলবাবু এবার আসল কথাটা না বলে পারলেন না।

'আমার ডায়ালগটা যদি এই বেলা দিতেন তো—'

'ডায়ালগ ? আসুন আমার সঙ্গে।'

নরেশ তেপায়া যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পটলবাবু।

'এই শশাঙ্ক !'

একটি হাফশার্ট-পরা ছোকরা এগিয়ে এল নরেশের দিকে। নরেশ তাকে বলল, 'এই ভদ্রলোক ওঁর ডায়ালগ চাইছেন। একটা কাগজে লিখে দে তো। সেই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

শশাঙ্ক পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন দাদু... এই জ্যোতি, তোর কলমটা একটু দে তো। দাদুকে ডায়ালগটা দিয়ে দিই।'

জ্যোতি ছেলেটি তার পকেট থেকে একটা লাল কলম বার করে শশাঙ্কর দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

পটলবাবু কাগজটার দিকে চেয়ে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—'আঃ'।

আঃ ?

পটলবাবুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হয়। গরম হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'দাদু যে গুম মেরে গেলেন ? কঠিন মনে হচ্ছে ?'

এরা কি তাহলে ঠাট্টা করছে ? সমস্ত ব্যাপারটাই কি একটা বিরাট পরিহাস ? তাঁর মতো নিরীহ নির্বিবাদ মানুষকে ডেকে এনে এত বড় শহরের এত বড় রাস্তার মাঝখানে ফেলে রঙতামাশা ? এত নিষ্ঠুরও কি মানুষ হতে পারে ?

পটলবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো ?'

'শুধু "আঃ" ? আর কোনো কথা নেই ?'

শশাঙ্ক চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী দাদু ? এ কি কম হল নাকি ? এ তো রেগুলার স্পীকিং পার্ট ! বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পীকিং পার্ট—আপনি বলছেন কী ? আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই ! জানেন, আমাদের এই ছবিতে আজ অবধি প্রায় দেড়শ লোক পার্ট করে গেছে যারা কোনো কথাই বলেনি। শুধু ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। অনেকে আবার হাঁটেওনি, স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কারুর কারুর মুখ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আজকেও দেখুন না—এই যে ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন ল্যাম্পপোস্টটার পাশে ; ওঁরা সবাই আছেন আজকের সীনে, কিন্তু একজনেরও একটিও কথা নেই। এমনকি আমাদের যে নায়ক চঞ্চলকুমার—তারও আজ কোনো ডায়ালগ নেই। কেবলমাত্র আপনার কথা, বুঝেছেন ?'

এবার জ্যোতি বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে পটলবাবুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'শুনুন দাদু—ব্যাপারটা বুঝে নিন। চঞ্চলকুমার হলেন এই আপিসের বড় চাকুরে। সীনটায় আমরা দেখাচ্ছি যে আপিসে একটা ক্যাশ ভাঙার খবর পেয়ে উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে দৌড়ে আপিসে ঢুকছেন। ঠিক সেই সময় সামনে পড়ে গেছেন আপনি—একজন পেডেস্ট্রিয়ান—বুঝেছেন ? লাগছে ধাক্কা—বুঝেছেন ? আপনি ধাক্কা খেয়ে বলছেন 'আঃ', আর চঞ্চল আপনার দিকে দৃক্‌পাত না করে ঢুকে যাচ্ছে আপিসে। আপনাকে অগ্রাহ্য করাতে তার মানসিক অবস্থাটা ফুটে বেরুচ্ছে—বুঝেছেন ? ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে দেখুন !'

এবার শশাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল, 'শুনলেন তো ? যান, এবার একটু ওদিকটায় যান দিকি ! এদিকটায় ভিড় করলে কাজের অসুবিধা হবে। আরেকটা শট্ আছে, তারপর আপনার ডাক পড়বে।'

পটলবাবু আস্তে আস্তে আবার পানের দোকানটার দিকে সরে গেলেন। ছাউনির তলায় পৌঁছে হাতের কাগজটার দিকে আড়দৃষ্টিতে দেখে, আশপাশের কেউ তাঁর দিকে দেখছে কিনা দেখে কাগজটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আঃ !'

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পটলবাবুর বুকের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল।

শুধু একটি মাত্র কথা—কথাও না, শব্দ—আঃ !

গরম অসহ্য হয়ে আসছে। গায়ের কোটটার মনে হয় যেন মনখানেক ওজন। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না ; পা অবশ হয়ে গেছে।

পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে পানের দোকানের ওদিকের আপিসটার দরজার সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। সাড়ে-ন'টা বাজে। করালীবাবুর বাড়িতে শ্যামাসঙ্গীত হয় রোববার সকালে ; পটলবাবু নিয়মিত গিয়ে শোনেন। বেশ লাগে। সেইখানেই

যাবেন নাকি চলে ? গেলে ক্ষতিটা কী ? এইসব বাজে, খেলো লোকের সংসর্গে রবিবারের সকালটা মাটি করে লাভ আছে কিছু ? আর অপমানের বোঝাটাও যে বইতে হবে সেই সঙ্গে।

'সাইলেন্স !'

দুর্ ! নিকুচি করেছে তোর সাইলেন্সের। যা-না কাজ, তার বত্রিশ গুণ ফুটুনি আর ভড়ং। এর চেয়ে থিয়েটারের কাজ—

থিয়েটার...থিয়েটার...

অনেক কাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের মধ্যে জেগে উঠল। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা—'একটা কথা মনে রেখো পটল। যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতেকোনোঅপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা। থিয়েটারের কাজ হল পাঁচজনে মিলেমিশে কাজ। সকলের সাফল্য জড়িয়েই নাটকের সাফল্য।'

পাকড়াশী মশাই দিয়েছিলেন এ উপদেশ পটলবাবুকে। গগন পাকড়াশী। পটলবাবুর নাট্যগুরু ছিলেন তিনি। আশ্চর্য অভিনেতা ছিলেন গগন পাকড়াশী, অথচ দম্ভের লেশমাত্র ছিল না তাঁর মনে। ঋষিতুল্য মানুষ, আর শিল্পীর সেরা শিল্পী।

আরো একটা কথা বলতেন পাকড়াশী মশাই—'নাটকের এক-একটি কথা হল এক-একটি গাছের ফল। সবাই নাগাল পায় না সে-ফলের। যারা পায় তারাও হয়ত তার খোসা ছাড়াতে জানে না। কাজটা আসলে হল তোমার—অভিনেতার। তোমাকে জানতে হবে কী করে সে ফল পেড়ে তার খোসা ছাড়িয়ে তার থেকে রস নিংড়ে বার করে সেটা লোকের কাছে পরিবেশন করতে হয়।'

গগন পাকড়াশীর কথা মনে হতে পটলবাবুর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল।

সত্যিই কি তাঁর আজকের পার্টটার মধ্যে কিছুই নেই ? একটিমাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে—'আঃ'। কিন্তু একটি কথা বলেই কি এক কথায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় ?

আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ,—পটলবাবু বার বার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানাভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে। চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ বলে,

গরমে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ-দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের ; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরো আরেক রকম আঃ। এ ছাড়া কতরকম আঃ রয়েছে—দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোট করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ—ঃ, চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়া গলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ'-টা খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য ! পটলবাবুর মনে হল তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।

এত নিরুৎসাহ হচ্ছিলেন কেন তিনি ? এই একটা কথা যে একেবারে সোনার খনি। তেমন তেমন অভিনেতা তো এই একটা কথাতেই বাজিমাত করে দিতে পারে !

'সাইলেন্স !'

পরিচালক মশাই ওদিকে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন। পটলবাবু দেখলেন জ্যোতি ছোকরাটি তাঁর কাছেই ভিড় সরাচ্ছে। ছোকরাকে একটা কথা বলা দরকার। পটলবাবু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

'আমার কাজটা হতে আর কতক্ষণ দেরি ভায়া ?'

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদু ? একটু ধৈর্য ধরতে হয় এসব ব্যাপারে। আরো আধ ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! অপেক্ষা করব বইকি ! আমি এই কাছাকাছি আছি।'

'দেখবেন, আবার সটকাবেন না যেন।'

জ্যোতি চলে গেল।

'স্টার্ট সাউন্ড !'

পটলবাবু পা টিপে টিপে শব্দ না করে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা নিরিবিলি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ভালোই হল। হাতে সময় পাওয়া গেছে কিছুটা ! এরা যখন রিহার্সাল-টিহার্সালের বিশেষ ধার ধারছে না, তখন তিনি নিজেই নিজের অংশটা কিছুটা অভ্যাস করে নেবেন। গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার। যে-ক'জন লোক ছিল সবাই ফ্যারাডে হাউসের দিকে বায়স্কোপের তামাশা দেখতে চলে গেছে।

পটলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে আজকের এই বিশেষ দৃশ্যের বিশেষ 'আঃ' শব্দটি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলেন। আর সেই সঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেলে মুখটা কিরকম বিকৃত হতে পারে, হাতদুটো কতখানি বেঁকে কিরকম ভাবে চিতিয়ে উঠতে পারে, আঙুলগুলো কতখানি ফাঁক হতে পারে, আর পায়ের অবস্থা কিরকম হতে পারে—এই সবই একটা কাঁচের জানালায় নিজের ছায়া দেখে ঠিক করে নিতে লাগলেন।

ঠিক আধ ঘন্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল ; এখন আর তাঁর মনে কোনো নিরুৎসাহের ভাব নেই। উদ্বেগও কেটে গেছে তাঁর মন থেকে। রয়েছে কেবল একটা চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ; পঁচিশ বছর আগে স্টেজে অভিনয় করার সময় একটা বড় দৃশ্যে নামবার আগে যে ভাবটা তিনি অনুভব করতেন, সেই ভাব।

পরিচালক বরেন মল্লিক পটলবাবুকে কাছে ডেকে বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। আমি প্রথমে বলব "স্টার্ট সাউন্ড"। তার উত্তরে ভেতর থেকে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বলবে "রানিং"। বলামাত্র ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করবে। তারপর আমি বলব "অ্যাকশন"! বললেই আপনি ওই থামের কাছটা থেকে এইদিকে হেঁটে আসতে শুরু করবেন, আর নায়ক এই গাড়ির দরজা থেকে যাবে ওই আপিসের গেটের দিকে। আন্দাজ করে নেবেন যাতে ফুটপাথের এই এরকম জায়গাটায় কলিশনটা হয়। নায়ক আপনাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাবে আপিসে, আর আপনি বিরক্ত হয়ে "আঃ" বলে আবার হাঁটতে শুরু করবেন। কেমন ?'

পটলবাবু বললেন, 'একটা রিহার্সলি... ?'

'না না', বরেনবাবু বাধা দিলেন। 'মেঘ করে আসছে মশাই। রিহার্সালের টাইম নেই। রোদ থাকতে থাকতে নেওয়া দরকার শট্‌টা।'

'কেবল একটা কথা...'

'আবার কী ?'

গলিতে রিহার্সলি দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে, আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই...মানে, অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে—'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো...ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো...হ্যাঁ। এইবার ওই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান। চঞ্চল, তুমি রেডি ?'

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার।'

'গুড। সাইলেন্স !'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্টো, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টারটা পুরোপুরি আসছে না।'

'কিরকম গোঁফ স্যার ? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, না বাটারফ্লাই ? রেডি আছে সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

একটি কালো বেঁটে ব্যাকব্রাশ-করা ছোকরা পটলবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের একটা টিনের বাক্স থেকে একটা ছোট্ট চৌকো কালো গোঁফ বার করে আঠা লাগিয়ে পটলবাবুর নাকের নিচে সেঁটে দিল।

পটলবাবু বললেন, 'দেখো বাপু, ধাক্কাধাক্কিতে খুলে যাবে না তো ?'

ছোকরা হেসে বলল, 'ধাক্কা কেন ? আপনি দারা সিং-এর সঙ্গে কুস্তি করুন না—তাও খুলবে না।'

লোকটার হাতে আয়না ছিল, পটলবাবু টুক করে তাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। সত্যিই তো ! বেশ মানিয়েছে তো ! খাসা মানিয়েছে। পটলবাবু পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না।

'সাইলেন্স ! সাইলেন্স !'

পটলবাবুর গোঁফ পরা দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বরেন মল্লিকের হুঙ্কারে সেটা থেমে গেল।

পটলবাবু লক্ষ করলেন সমবেত জনতার বেশির ভাগ লোকই তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

'স্টার্ট সাউন্ড !'

পটলবাবু গলাটা খাঁকরিয়ে নিলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পা আন্দাজ হাঁটলে পর পটলবাবু ধাক্কার জায়গায় পৌঁছবেন। আর চঞ্চলকুমারের হাঁটতে হবে বোধহয় চার পা। সুতরাং দু'জনে যদি একসঙ্গে রওনা হন, তাহলে পটলবাবুকে একটু বেশি জোরে হাঁটতে হবে, তা না হলে—

'রানিং।'

পটলবাবু খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরলেন। দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে ছ'আনা বিস্ময় মিশিয়ে আঃ-টা বললে পরেই—

'অ্যাকশন !'

জয় গুরু !

খচ খচ খচ খচ খচ—ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্ ! পটলবাবু হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন। নায়কের মাথার সঙ্গে তাঁর কপালের ঠোকাঠুকি লেগেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে কাগজটা সামলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ

করলেন।

'কাট!'

'ঠিক হল কি?' পটলবাবু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

'বেড়ে হয়েছে! আপনি তো ভালো অভিনেতা মশাই!...সুরেন, কালো কাঁচটা একবার চোখে লাগিয়ে দেখো তো মেঘের কী অবস্থা।'

শশাঙ্ক এসে বলল, 'দাদুর চোট লাগেনি তো?'

চঞ্চলকুমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এসে বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়—ওঃ!'

নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু। আরেকটা শট্ নিয়েই আপনার ব্যাপারটা করে দিচ্ছি।'

পটলবাবু ভিড় ঠেলে ঘাম মুছতে মুছতে আবার পানের দোকানের ছায়াটায় এসে দাঁড়ালেন। মেঘে সূর্য ঢেকে গরমটা একটু কমেছে; কিন্তু পটলবাবু তাও কোটটা খুলে ফেললেন। আঃ, কী আরাম! একটা গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায়নি। গগন পাকড়াশী আজ তাঁকে দেখলে সত্যিই খুশি হতেন। কিন্তু এরা কি সেটা বুঝতে পেরেছে? পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন? এই সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য তাঁর যে আগ্রহ আর পরিশ্রম, তার কদর কি এরা করতে পারে? সে ক্ষমতা কি এদের আছে? এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস। টাকা! কত টাকা? পাঁচ, দশ, পঁচিশ? টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?...

মিনিট দশেক পরে নরেশ পানের দোকানের কাছে পটলবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোককে আর পেল না। সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা? আচ্ছা ভোলা মন তো!

বরেন মল্লিক হাঁক দিলেন, 'রোদ বেরিয়েছে! সাইলেন্স! সাইলেন্স!...ওহে নরেশ, চলে এসো, ভিড় সামলাও!'

খগম

পেট্রোম্যাক্সের আলোতে বসে ডিনার খাচ্ছি, সবেমাত্র ডালনার ডিমে একটা কামড় দিয়েছি, এমন সময় চৌকিদার লছমন জিগ্যেস করল, 'আপলোগ ইমলিবাবাকো দর্শন নেহি করেঙ্গে?'

বলতে বাধ্য হলাম যে ইমলিবাবার নামটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন, তাই দর্শন করার প্রশ্নটা ওঠেইনি। লছমন বলল জঙ্গল বিভাগের যে জীপটা আমাদের জন্য মোতায়েন হয়েছে তার ড্রাইভারকে বললেই সে আমাদের বাবার ডেরায় নিয়ে যাবে। জঙ্গলের ভিতরেই তার কুটির, ভারী মনোরম পরিবেশ, সাধু হিসেবেও নাকি খুব উঁচু স্তরের; ভারতবর্ষের নানান জায়গা থেকে গণ্যমান্য লোকেরা এসে তাঁকে দেখে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া আর যে ব্যাপারটা শুনে আরো কৌতূহল হল সেটা হল এই যে, বাবার নাকি একটা পোষা কেউটে আছে, সেটা বাবার কুটিরের কাছেই একটা গর্তে থাকে, আর রোজ সন্ধে বেলা গর্ত থেকে বেরিয়ে বাবার কাছে এসে ছাগলের দুধ খায়।

ধূর্জটিবাবু সব শুনেটুনে মন্তব্য করলেন যে দেশটা বুজরুকিতে ছেয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা দিন দিন বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। পশ্চিমে যতই বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়ছে, আমাদের দেশটা নাকি ততই আবার নতুন করে কুসংস্কারের অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে।—'হোপলেস ব্যাপার মশাই। ভাবলে মাথায় রক্ত উঠে যায়।'

কথাটা বলে ধূর্জটিবাবু হাত থেকে কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে পাশ থেকে ফ্লাই-ফ্ল্যাপ বা মক্ষিকা-মারণ দণ্ডটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর এক অব্যর্থ চাপড়ে একটা মশা মেরে ফেললেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। বেঁটে রোগা ফরসা চোখাচোখা চেহারা, চোখ দুটো রীতিমত কটা। আমার সঙ্গে আলাপ এই ভরতপুরে এসে। আমি এসেছি আগ্রা হয়ে, যাব জয়পুরে

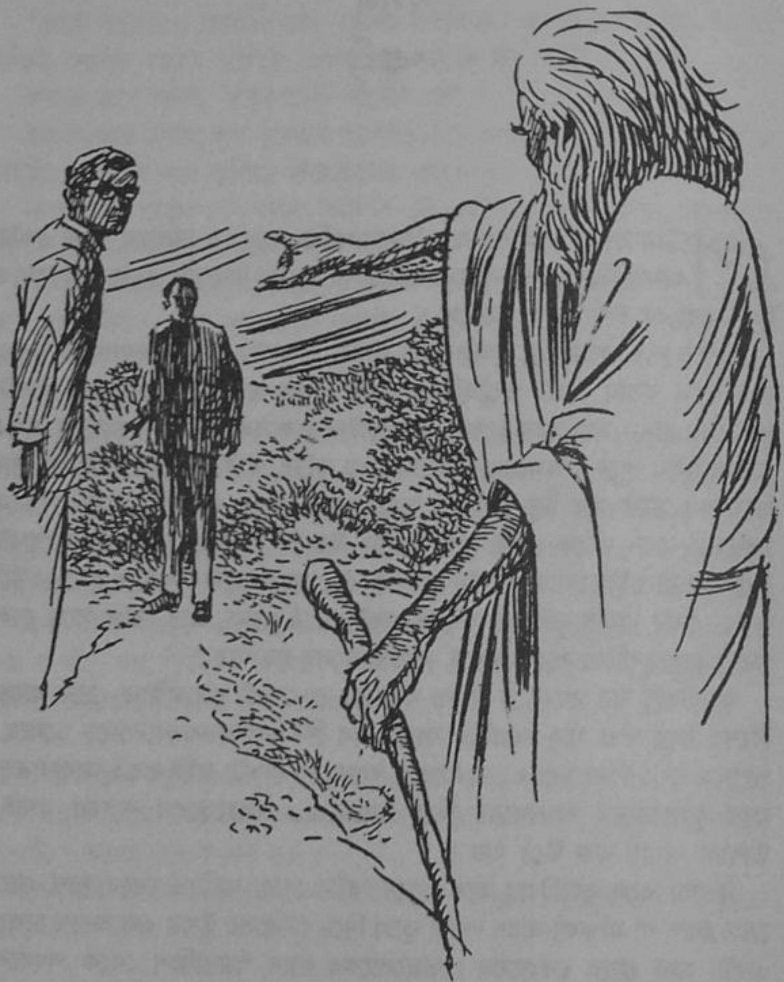

মেজদার কাছে দু হপ্তার ছুটি কাটাতে। এখানে এসে ডাকবাংলোয় বা টুরিস্ট লজে জায়গা না পেয়ে শেষটায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শহরের বাইরে এই ফরেস্ট রেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। তাতে অবিশ্যি আক্ষেপের কিছু নেই, কারণ জঙ্গলে ঘেরা রেস্ট হাউসে থাকার মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চকর আরাম আছে।

ধূর্জটিবাবু আমার একদিন আগে এসেছেন। কেন এসেছেন তা এখনো খুলে বলেননি, যদিও নিছক বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কারণ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা দুজনে একই জীপে ঘোরাফেরা করছি। কাল এখান থেকে ২২ মাইল পুবে দীগ বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম সেখানকার কেল্লা আর প্রাসাদ দেখতে। ভরতপুরের কেল্লাও আজ সকালে দেখা হয়ে গিয়েছে, আর বিকেলে গিয়েছিলাম কেওলাদেওয়ের ঝিলে পাখির আস্তানা দেখতে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সাত মাইলের উপর লম্বা ঝিল, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো ডাঙা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, আর সেই ডাঙার প্রত্যেকটিতে রাজ্যের পাখি এসে জড়ো হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি আমি কোনো কালে চোখেই দেখিনি। আমি অবাক হয়ে পাখি দেখছি, আর ধূর্জটিবাবু ক্ষণে ক্ষণে গজ গজ করে উঠছেন আর হাতদুটোকে অস্থিরভাবে এদিকে ওদিকে নাড়িয়ে মুখের আশপাশ থেকে উনকি সরাবার চেষ্টা করছেন। উনকি হল একরকম ছোট্ট পোকা। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মাথার চারপাশে ঘোরে আর নাকে মুখে বসে। তবে পোকাগুলো এতই ছোট যে তাদের অনায়াসে অগ্রাহ্য করে থাকা যায়; কিন্তু ধূর্জটিবাবু দেখলাম বারবার বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এত অধৈর্য হলে কি চলে?

সাড়ে আটটার সময় খাওয়া শেষ করে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চাঁদনি রাতে জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে ধূর্জটিবাবুকে বললাম, 'ওই যে সাধুবাবার কথা বলছিল—যাবেন নাকি দেখতে?'

ধূর্জটিবাবু তাঁর হাতের সিগারেটটা একটা ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়ির দিকে তাগ করে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'কেউটে পোষ মানে না, মানতে পারে না। সাপ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ছেলেবেলায় জলপাইগুড়িতে থাকতাম, নিজে হাতে অজস্র সাপ মেরেছি। কেউটে হচ্ছে বীভৎস শয়তান সাপ, পোষ মানানো অসম্ভব; কাজেই সাধুবাবার খবরটা কতটা সত্যি সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

আমি বললাম, 'কাল তো বিকেলে এমনিতে কোনো প্রোগ্রাম নেই, সকালে বায়ানের কেল্লা দেখে আসার পর থেকেই তো ফ্রি।'

'আপনার বুঝি সাধুসন্ন্যাসীদের ওপর খুব ভক্তি?' প্রশ্নটার পিছনে বেশ একটা খোঁচা রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি জবাবটা দিলাম খুব সরলভাবেই।

'ভক্তির কথা আর আসছে কী করে, কারণ সাধুসংসর্গের তো কোনো সুযোগই

হয়নি এখন পর্যন্ত। তবে কৌতূহল যে আছে সেটা অস্বীকার করব না।'

'আমারও ছিল এককালে, কিন্তু একটা অভিজ্ঞতার পর থেকে আর...'

অভিজ্ঞতাটা হল—ধূর্জটিবাবুর নাকি ব্লাড প্রেসারের ব্যারাম, বছর দশেক আগে তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের পাল্লায় পড়ে তিনি এক সাধুবাবার দেওয়া টোট্‌কা ওষুধ খেয়ে নাকি সাতদিন ধরে অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন, আর তার ফলে তাঁর রক্তের চাপও নাকি গিয়েছিল বেড়ে। সেই থেকে ধূর্জটিবাবুর ধারণা হয়েছে ভারতবর্ষের শতকরা নব্বুই ভাগ সাধুই হচ্ছে আসলে ভণ্ড অসাধু।

ভদ্রলোকের বাবা-বিদ্বেষটা বেশ মজার লাগছিল, তাই তাঁকে খানিকটা উস্‌কোনোর জন্যই বললাম, 'কেউটের পোষ মানার কথা যে বলছেন, আমি-আপনি পোষ মানাতে পারব না নিশ্চয়ই, কিন্তু হিমালয়ের কোনো কোনো সাধু তো শুনেছি একেবারে বাঘের গুহায় বাঘের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে।'

'শুনেছেন তো, দেখেছেন কি?'

স্বীকার করতেই হল যে দেখিনি।

'দেখবেন না। এ হল আষাঢ়ে গপ্পোর দেশ। শুনবেন অনেক কিছুই, কিন্তু চাক্ষুস দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন না। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতই দেখুন না। বলছে ইতিহাস, কিন্তু আসলে আজগুবি গপ্পের ডিপো! রাবণের দশটা মাথা, হনুমান ল্যাজে আগুন নিয়ে লঙ্কা পুড়োচ্ছে, ভীমের অ্যাপিটাইট, ঘটোৎকচ, হিড়িম্বা, পুষ্পক রথ, কুম্ভকর্ণ—এগুলোর চেয়ে বেশি ননসেন্স আর কী আছে? আর সাধু-সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামির কথা যদি বলেন সেতো এই সব পুরাণ থেকেই শুরু হয়েছে। অথচ সারা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকে অ্যাদ্দিন ধরে এই সব গিলে খাচ্ছে!'

বায়ানের কেল্লা দেখে রেস্ট হাউসে ফিরে লাঞ্চ ও বিশ্রাম সেরে ইমলিবাবার ডেরায় পৌঁছতে চারটে বেজে গেল। ধূর্জটিবাবু ও ব্যাপারে আর আপত্তি করেননি। হয়ত তাঁর নিজেরও বাবা সম্পর্কে একটু কৌতূহল হচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে একটা দিব্যি পরিষ্কার খোলা জায়গায় একটা বিরাট তেঁতুল গাছের নিচে বাবার কুটির। গাছের থেকেই বাবার নামকরণ, আর সেটা করেছে স্থানীয় লোকেরা। বাবার আসল নাম কী তা কেউ জানে না।

খেজুর পাতার ঘরে একটি মাত্র চেলা সঙ্গে নিয়ে ভাল্লুকের ছালের উপর বসে আছেন বাবা। চেলাটির বয়স অল্প, বাবার বয়স কত তা বোঝার জো নেই। সূর্য ডুবতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি, কিন্তু তেঁতুলগাছের ঘন ছাউনির জন্যে এ জায়গাটা এখনই বেশ অন্ধকার। কুটিরের সামনে ধুনি জ্বলছে, বাবার হাতে গাঁজার কলকে। ধুনির আলোতেই দেখলাম কুটিরের এক পাশে একটা দড়ি

টাঙানো, তাতে একটা গামছা আর একটা কৌপীন ছাড়া ঝোলানো রয়েছে গোটা দশেক সাপের খোলস।

আমাদের দেখে বাবা কল্‌কের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ধূর্জটিবাবু ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'বৃথা সময় নষ্ট না করে আসল প্রসঙ্গে চলে যান। দুধ খাওয়ার সময়টা কখন জিগ্যেস করুন।'

'আপ বালকিষণসে মিল্‌না চাহ্‌তে হেঁ?'

ইমলিবাবা আশ্চর্য উপায়ে আমাদের মনের কথা জেনে ফেলেছেন। কেউটের নাম যে বালকিষণ সেটা আমাদের জীপের ড্রাইভার দীনদয়াল কিছুক্ষণ আগেই আমাদের বলেছে। ইমলিবাবাকে বলতেই হল যে আমরা তাঁর সাপের কথা শুনেছি, এবং পোষা সাপের দুধ খাওয়া দেখতে আমাদের ভারী আগ্রহ। সে সৌভাগ্য হবে কি?

ইমলিবাবা আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বললেন, বালকিষণ রোজই সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাবার ডাক শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে কুটিরে এসে দুধ খেয়ে যায়, দুদিন আগে পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু গতকাল থেকে তার শরীরটা নাকি তেমন ভালো নেই। আজ পূর্ণিমা, আজও সে আসবে না। আসবে আবার কাল থেকে।

সাপের শরীর খারাপ হয় এ খবরটা আমার কাছে নতুন। তবে পোষা তো-হবে নাই বা কেন। গরু ঘোড়া কুকুর ইত্যাদির জন্য তো হাসপাতালই আছে।

বাবার চেলা আরো একটা খবর দিল। একে তো শরীর খারাপ, তার উপর কিছু কাঠ পিঁপড়ে নাকি তার গর্তে ঢুকে বালকিষণকে বেশ কাবু করে ফেলেছিল। সেই সব পিঁপড়ে নাকি বাবার অভিশাপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কথাটা শুনে ধূর্জটিবাবু আমার দিকে আড়চোখে চাইলেন। আমি কিন্তু ইমলিবাবার দিকেই দেখছিলাম। চেহারায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। পরনে সাধারণ একটা গেরুয়া আলখাল্লা। মাথায় জটা আছে, কিন্তু তাও তেমন জবরজং কিছু নয়। দুকানে দুটো লোহার মাকড়ি, গলায় গোটা চারেক ছোট বড় মালা, ডান কনুইয়ের উপরে একটা তাবিজ। অন্য পাঁচটা সাধুবাবার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। কিন্তু তাও সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় ধুনির পিছনে বসা লোকটার দিক থেকে কেন জানি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে চেলাটি দুটো চাটাই বার করে এনে বাবার হাত দশেক দূরে বিছিয়ে দিল। কিন্তু বাবার পোষা কেউটেকেই যখন দেখা যাবে না তখন আর বসে কী হবে? বেশি দেরি করলে আবার ফিরতে রাত হয়ে যাবে। গাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা, আর আশেপাশে জন্তু-জানোয়ারেরও অভাব নেই। হরিণের পালতো রোজই দেখছি। তাই শেষ পর্যন্ত আর বসলাম না। বাবাকে নমস্কার করতে তিনি মুখ থেকে কল্‌কে না সরিয়ে চোখ বুজে মাথা হেঁট করে প্রতিনমস্কার জানালেন। আমরা

দুজনে শ খানেক গজ দূরে রাস্তার ধারে রাখা জীপের উদ্দেশে রওনা দিলাম। কিছু আগেও চারিদিকের গাছপালা থেকে বাসায়-ফেরা পাখির কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম, এখন সব নিস্তব্ধ।

কুটির থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গিয়ে ধূর্জটিবাবু হঠাৎ থেমে বললেন, 'সাপটা না হয় নাই দেখা গেল, তার গর্তটা অন্তত একবার দেখতে চাইলে হত না?'

আমি বললাম, 'তার জন্যেতো ইমলিবাবার কাছে যাবার কোনো দরকার নেই, আমাদের ড্রাইভার দীনদয়াল তো বলছিল ও গর্তটা দেখেছে।'

'ঠিক কথা।'

গাড়ি থেকে দীনদয়ালকে নিয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম। এবার কুটিরের দিকে না গিয়ে একটা বাদাম গাছের পাশ দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে খানিকদূর এগিয়ে যেতেই সামনে একটা কাঁটাঝোপ পড়ল। আশেপাশে পাথরের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে মনে হল এককালে এখানে হয়ত একটা দালান জাতীয় কিছু ছিল। দীনদয়াল বলল ওই ঝোপটার ঠিক পিছনেই নাকি সাপের গর্ত। এমনি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কারণ আলো আরো কমে এসেছে। ধূর্জটিবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করে ঝোপের উপর আলো ফেলতেই পিছনে গর্তটা দেখা গেল। যাক, গর্তটা তাহলে সত্যিই আছে। কিন্তু সাপ? সে কি আর অসুস্থ অবস্থায় আমাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য বাইরে বেরোবে? সত্যি বলতে কি, সাধুবাবার হাতে কেউটের দুধ খাওয়া দেখার বাসনা থাকলেও সেই কেউটের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দর্শন করার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ধূর্জটিবাবুর কৌতূহল দেখলাম আমার চেয়েও বেশি। আলোয় যখন কাজ হল না তখন ভদ্রলোক মাটি থেকে ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ঝোপের উপর ফেলতে আরম্ভ করলেন।

এই বাড়াবাড়িটা আমার ভালো লাগল না। বললাম, 'কী হল মশাই? আপনার দেখি রোখ চেপে গেছে। আপনি তো বিশ্বাসই করছিলেন না যে সাপ আছে।'

ভদ্রলোক এবার একটা বেশ বড় ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এখনো করছি না। এই ঢেলাতেও যদি ফল না হয় তাহলে বুঝব বাবাজী সম্বন্ধে এক স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প প্রচার করা হয়েছে। লোকের ভুল বিশ্বাস যত ভাঙানো যায় ততই মঙ্গল।'

ঢেলাটা একটা ভারী শব্দ করে ঝোপের উপর প'ড়ে কাঁটা সমেত পাতাগুলোকে তছনছ করে দিল। ধূর্জটিবাবু টর্চটা ধরে আছেন গর্তের উপর। কয়েক মুহূর্ত সব চুপ—কেবল বনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঝিঁঝি সবেমাত্র ডাকতে আরম্ভ করেছে। এবার তার সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ হল। একটা

শুকনো সুরহীন শিসের মতো শব্দ। তারপর পাতার খস্‌খসানি, আর তারপর টর্চের আলোয় দেখা গেল একটা কালো মসৃণ জিনিসের খানিকটা। সেটা নড়ছে, সেটা জ্যান্ত, আর ক্রমেই সেটা গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এবার ঝোপের পাতা নড়ে উঠল, আর তার পরমুহূর্তেই তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা সাপের মাথা। টর্চের আলোয় দেখলাম কেউটের জ্বলজ্বলে চোখ, আর তার দু'ভাগে চেরা জিভ, যেটা বার বার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে লিক্‌লিক্ করে আবার সুড়ুৎ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। দীনদয়াল কিছুক্ষণ থেকেই জিপে ফিরে যাবার জন্য তাগাদা করছিল, এবার ধরা গলায় অনুনয়ের সুরে বলল, 'ছোড় দিজিয়ে বাবু!—আব্ তো দেখ লিয়া, আব্ ওয়াপস চলিয়ে।'

টর্চের আলোর জন্যই বোধহয় বালকিষণ এখনো মাথাটা বার করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করছে। আমি সাপ দেখেছি অনেক, কিন্তু এত কাছ থেকে এভাবে কালকেউটে কখনো দেখিনি। আর কেউটে আক্রমণের চেষ্টা না করে চুপচাপ চেয়ে রয়েছে এরকমও তো কখনো দেখিনি। হঠাৎ টর্চের আলোটা কেঁপে উঠে সাপের উপর থেকে সরে গেল। তারপর যে কাণ্ডটা ঘটল সেটার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ধূর্জটিবাবু হঠাৎ একটা পাথরের টুক্‌রো তুলে নিয়ে চোখের নিমেষে সেটা বালকিষণের মাথার দিকে তাগ করে ছুঁড়ে মারলেন। আর তার পরেই পর পর আরো দুটো। একটা বিশ্রী আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে আমি বলে উঠলাম, 'আপনি এটা কী করলেন ধূর্জটিবাবু!'

ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বেশ উল্লাসের সঙ্গেই বললেন, 'ওয়ান কেউটে লেস্!'

দীনদয়াল হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে ঝোপটার দিকে চেয়ে আছে। ধূর্জটিবাবুর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে আমিই এবার গর্তের উপর আলো ফেললাম। বালকিষণের অসাড় দেহের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ঝোপের পাতায় লেগে রয়েছে সাপের মাথা থেকে ছিট্‌কিয়ে বেরোন খানিকটা রক্ত।

এর মধ্যে কখন যে ইমলিবাবা আর তার চেলা এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারিনি। ধূর্জটিবাবুই প্রথম পিছন ফিরলেন। তারপর আমিও ঘুরে দেখি বাবা হাতে একটা যষ্টি নিয়ে আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেঁটে খেজুর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। বাবা যে এত লম্বা সেটা বসা অবস্থায় বুঝতে পারিনি। আর তাঁর চোখের চাহনির বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বিস্ময়, ক্রোধ আর বিদ্বেষ মেশানো এমন চাহনি আমি কারো চোখে দেখিনি।

বাবার ডান হাতটা এবার সামনের দিকে উঠে এলো। এখন সেটা নির্দেশ

করছে ধূর্জটিবাবুর দিকে। হাতের তর্জনীটা এবার সামনে দিকে বেরিয়ে এসে নির্দেশটা আরো স্পষ্ট হল। এই প্রথম দেখলাম বাবার আঙুলের এক একটা নখ প্রায় দু'ইঞ্চি লম্বা। কার কথা মনে পড়ছে বাবাকে দেখে? ছেলেবেলায় দেখা বীডন স্ট্রীটে আমার মামাবাড়ির দেয়ালে টাঙানো রবিবর্মার আঁকা একটা ছবি। দুর্বাসা মুনি অভিশাপ দিচ্ছেন শকুন্তলাকে। ঠিক এইভাবে হাত তোলা, চোখে ঠিক এই চাহনি।

কিন্তু অভিশাপের কথা কিছু বললেন না ইমলিবাবা। তাঁর গম্ভীর চাপা গলায় হিন্দীতে তিনি যা বললেন তার মানে হল—একটা বালকিষণ গেছে তাতে কী হল? আরেকটা আসবে। বালকিষণের মৃত্যু নেই। বালকিষণ অমর।

ধূর্জটিবাবু তাঁর ধুলো মাখা হাত রুমাল মুছে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চলুন।' বাবার চেলা এসে গর্তের মুখ থেকে কেউটের মৃতদেহটা বার করে নিল—বোধহয় তার সৎকারের ব্যবস্থার জন্য। সাপের দৈর্ঘ্য দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। কেউটে যে এত লম্বা হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ইমলিবাবা ধীরে ধীরে তাঁর কুটিরের দিকে চলে গেলেন। আমরা তিনজন গিয়ে জীপে উঠলাম।

রেস্ট হাউসে ফেরার পথে ধূর্জটিবাবুকে গুম্ হয়ে বসে থাকতে দেখে তাঁকে একটা কথা না বলে পারলাম না। বললাম, 'সাপটা যখন লোকটার পোষা, আর আপনার কোনো অনিষ্টও করছিল না, তখন ওটাকে মারতে গেলেন কেন?'

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক বুঝি সাপ আর সাধুদের আরো কিছু কড়া কথা শুনিয়ে নিজের কুকীর্তি সমর্থন করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তিনি সে সব কিছুই না করে উল্টে আমাকে একটা সম্পূর্ণ অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—

'খগম কে বলুন তো মশাই, খগম?'

খগম? নামটা আবছা আবছা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় শুনেছি বা পড়েছি মনে পড়ল না। ধূর্জটিবাবু আরো বার দু-এক আপন মনে খগম খগম করে শেষটায় চুপ করে গেলেন। রেস্ট হাউসে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। ইমলিবাবার চেহারাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ছে—দুর্বাসার মতো চোখ পাকিয়ে হাত তুলে রয়েছেন ধূর্জটিবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কেন যে এমন মতিভ্রম হল কে জানে। তবে মন বলছে, ঘটনার শেষ দেখে এসেছি আমরা, কাজেই ও নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। বাবা নিজেই বলেছেন বালকিষণের মৃত্যু নেই। ভরতপুরের জঙ্গলে কি আর কেউটে নেই? কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই বাবার চেলা-চামুণ্ডারা আরেকটা কেউটে ধরে এনে বাবাকে উপহার দেবে।

ডিনারে লছমন মুরগীর কারি রেঁধেছিল, আর তার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা হাতের রুটি আর উরুৎকা ডাল। সারাদিনের ঘোরা-ফেরার পর খিদেটা দিব্যি হয়।

কলকাতায় রাত্রে যা খাই তার ডবল খেয়ে ফেলি অক্লেশে। ধূর্জটিবাবু ছোটখাট মানুষ হলে কী হবে—তিনিও বেশ ভালোই খেতে পারেন। কিন্তু আজ যেন মনে হল ভদ্রলোকের খিদে নেই। শরীর খারাপ লাগছে কিনা জিগ্যেস করাতে কিছু বললেন না। আমি বললাম, 'আপনি কি বালকিষণের কথা ভেবে আক্ষেপ করছেন?'

ধূর্জটিবাবু আমার কথায় মুখ খুললেন বটে, কিন্তু যা বললেন সেটাকে আমার প্রশ্নের উত্তর বলা চলে না। পেট্রোম্যাক্সের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গলাটাকে ভীষণ সরু আর মোলায়েম করে বললেন, 'সাপটা ফিস্‌ফিস্ করছিল...ফিস্‌ফিস্...করছিল....'

আমি হেসে বললাম, 'ফিস্‌ফিস্, না ফোঁশ ফোঁশ?'

ধূর্জটিবাবু আলোর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, ফিস্‌ফিস্।... সাপের ভাষা সাপের শিস, ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্...'

কথাটা বলে ভদ্রলোক নিজেই জিভের ফাঁক দিয়ে সাপের শিসের মতো শব্দ করলেন কয়েকবার। তারপর আবার ছড়া কাটার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'সাপের ভাষা সাপের শিস, ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্! বালকিষণের বিষম বিষ, ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্!...এটা কী? ছাগলের দুধ?'

শেষ কথাটা অবিশ্যি ছড়ার অংশ নয়। সেটা হল সামনে প্লেটে রাখা পুডিংকে উদ্দেশ করে।

লছমন শুধু দুধটা বুঝে ছাগল-টাগল না বুঝে বলল, 'হাঁ বাবু, দুধ হ্যায় আউর অ্যান্ডে ভি হ্যায়।'

দুধ আর ডিম দিয়ে যে পুডিং হয় সে কে না জানে?

ধূর্জটিবাবু লোকটা স্বভাবতই একটু খামখেয়ালি ও ছিটগ্রস্ত, কিন্তু ওঁর আজকের হাভভাবটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। তিনি নিজেই হয়ত সেটা বুঝতে পেরে যেন জোর করেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বড় বেশি রোদে ঘোরা হয়েছে ক'দিন, তাই বোধহয় মাথাটা...কাল থেকে একটু সাবধান হতে হবে।'

আজ শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, তাই খাবার পরে আর বাইরে না বসে ঘরে গিয়ে আমার সুটকেসটা গোছাতে লাগলাম। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে ভরতপুর ছাড়ব। মাঝরাত্তিরে সওয়াই মাধোপুরে চেঞ্জ, ভোর পাঁচটায় জয়পুর পৌঁছানো।

অন্তত এটাই ছিল আমার প্ল্যান। কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে গেল। মেজদাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিতে হল যে অনিবার্য কারণে যাওয়া একদিন পিছিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হল সেটাই এখন বলতে চলেছি। ঘটনাগুলো যথাসম্ভব স্পষ্ট ও অবিকলভাবে বলতে চেষ্টা করব। এ ঘটনা যে সকলে বিশ্বাস করবে না সেটা

জানি। প্রমাণ যাতে হতে পারত, সে জিনিসটা ইমলিবাবার কুটিরের পঞ্চাশ হাত উত্তরে হয়ত এখনো মাটিতে পড়ে আছে। সেটার কথা ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে, কাজেই সেটা যে প্রমাণ হিসেবে হাতে করে তুলে নিয়ে আসতে পারিনি তাতে আর আশ্চর্য কী ? যাক গে—এখন ঘটনায় আসা যাক।

সুটকেস গুছিয়ে, লণ্ঠনটাকে কমিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আড়ালে রেখে, রাতের পোশাক পরে বিছানায় উঠতে যাব, এমন সময় পুব দিকের দরজায় টোকা পড়ল। এই দরজার পিছনেই ধূর্জটিবাবুর ঘর।

দরজা খুলতেই ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'আপনার কাছে ফ্লিট জাতীয় কিছু আছে ? কিম্বা মশা তাড়ানোর অন্য কোনো ওষুধ ?'

আমি বললাম, 'মশা এলো কোত্থেকে ? আপনার ঘরের দরজা জানালায় জাল দেওয়া নেই ?'

'তা আছে।'

'তবে ?'

'তাও কী যেন কামড়াচ্ছে।'

'সেটা টের পাচ্ছেন আপনি ?'

'হাতে মুখে দাগ হয়ে যাচ্ছে।'

দরজার মুখটায় অন্ধকার, তাই ভদ্রলোকের চেহারাটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'আসুন ভিতরে। দেখি কী দাগ হল।'

ধূর্জটিবাবু ঘরের ভিতরে এলেন। লণ্ঠনটা সামনে তুলে ধরতেই দাগগুলো দেখতে পেলাম। রুহিতন মার্কা কালসিটের মতো দাগ। এ জিনিস আগে কখনো দেখিনি, আর দেখে মোটেই ভালো লাগল না। বললাম, 'বিদ্ঘুটে ব্যারাম বাধিয়েছেন। অ্যালার্জি থেকে হতে পারে। কাল সকালে উঠেই ডাক্তারের খোঁজ করতে হবে। আপনি বরং ঘুমোতে চেষ্টা করুন। ও নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আর এটা পোকার ব্যাপার নয়, অন্য কিছু। যন্ত্রণা হচ্ছে কি ?'

'উঁহু।'

'তাও ভাল। যান, শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন, আর আমিও বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম, রাত্রে ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস, এখানে লণ্ঠনের আলোয় সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। আর সত্যি বলতে কী সেটার প্রয়োজনও নেই। সারাদিনের ক্লান্তির পর বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম এসে যায়।

কিন্তু আজ আর সেটা হল না। একটা গাড়ির শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। সাহেবের গলা শুনতে পাচ্ছি, আর একটা অচেনা কুকুরের ডাক। টুরিস্ট এসেছে

রেস্ট হাউসে। কুকুরটা ধমক খেয়ে চেঁচানো থামাল। সাহেবরাও বোধহয় ঘরে ঢুকে পড়েছে। আবার সব নিস্তব্ধ। কেবল বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে ! না, শুধু ঝিঁঝি না। তা ছাড়াও আরেকটা শব্দ পাচ্ছি। আমার পুব দিকের প্রতিবেশী এখনো সজাগ। শুধু সজাগ নয়, সচল। তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। অথচ দরজার তলার ফাঁক দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি লণ্ঠনটা হয় নিভিয়ে দেওয়া হল না হয় পাশের বাথরুমে রেখে আসা হল। অন্ধকার ঘরে ভদ্রলোক পায়চারি করছেন কেন ?

এই প্রথম আমার সন্দেহ হল যে ভদ্রলোকের মাথায় হয়ত ছিটেরও একটু বেশি কিছু আছে। তার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দুদিনের। তিনি নিজে যা বলেছেন তার বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু সত্যি বলতে কী, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত, যাকে পাগলামো বলে, তার কিন্তু কোনো লক্ষণ আমি ধূর্জটিবাবুর মধ্যে দেখিনি। দীগ আর বায়ানের কেল্লা দেখতে দেখতে তিনি যে ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন তাতে মনে হয় ইতিহাসটা তাঁর বেশ ভালোভাবেই পড়া আছে। শুধু তাই নয়। আর্ট সম্বন্ধেও যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে সেটার প্রমাণও তিনি তাঁর কথাবার্তায় দিয়েছেন। রাজস্থানের স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান কারিগরদের কাজের কথা তিনি রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন। নাঃ—ভদ্রলোকর শরীরটাই বোধহয় খারাপ হয়েছে। কাল একজন ডাক্তারের খোঁজ করা অবশ্য-কর্তব্য।

আমার ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে তখন বলছে পৌনে এগারোটা। পুবের দরজায় আবার টোকা পড়ল। এবার বিছানা থেকে না উঠে একটা হাঁক দিলাম।—

'কী ব্যাপার ধূর্জটিবাবু ?'

'শ্-শ্-শ্-শ্...'

'কী বলছেন ?'

'শ্-শ্-শ্-শ্...'

বুঝলাম ভদ্রলোকের কথা আটকে গেছে। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি ! আবার বললাম, 'কী বলছেন ঠিক করে বলুন।'

'শ্-শ্-শ্-শুনবেন একটু ?'

অগত্যা উঠলাম। দরজা খুলতে ভদ্রলোক এমন একটা ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলেন যে আমার বেশ বিরক্তই লাগল।

'আচ্ছা স্-স্-স্-সাপ কি দন্ত্য স ?'

আমি আমার বিরক্তি লুকোবার কোনো চেষ্টা করলাম না।

'আপনি এইটে জানবার জন্য এত রাত্রে দরজা ধাক্কালেন ?'

'দন্ত্য স ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাপ মানে যখন সর্প, স্নেক, তখন দন্ত্য স।'

'আর তালব্য শ ?'

'সেটা অন্য শাপ। তার মানে—'

'—অভিশাপ।'

'হ্যাঁ, অভিশাপ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। শ্‌শ্‌শ্‌-শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমার একটু একটু মায়া হচ্ছিল। বললাম, 'আপনাকে বরং একটা ঘুমের ওষুধ দিই। ও জিনিসটা আছে আমার কাছে। খাবেন ?'

'না। শ্‌শ্‌শ্‌-শীতকালে এমনিতেই ঘুমোই। শ্‌-শ্‌-শুধু স্‌-স্‌-সন্ধ্যায় স্‌-স্‌-সূর্যাস্তের স্‌-স্‌-সময়—'

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার জিভে কিছু হয়েছে নাকি ? কথা আটকে যাচ্ছে কেন ? আপনার টর্চটা একবার দিন তো।'

ভদ্রলোকের পিছন পিছন আমিও ওঁর ঘরে ঢুকলাম। টর্চটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ছিল। সেটা জ্বেলে ভদ্রলোকের মুখের সামনে ধরতেই তিনি হাঁ করে জিভটা বার করে দিলেন। জিভে কিছু যে একটা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটু সরু লাল দাগ ডগা থেকে সুরু করে জিভের মাঝখান পর্যন্ত চলে গেছে।

'এটাতেও কোনো যন্ত্রণা নেই বলছেন ?'

'কই, না তো।'

কী যে ব্যারাম বাধিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক সেটা আমার বোঝার সাধ্য নেই।

এবারে ভদ্রলোকের খাটের দিকে চোখ গেল। বিছানার পরিপাটি ভাব দেখে বুঝলাম তিনি এখনো পর্যন্ত খাটে ওঠেননি। বেশ কড়া সুরে বললাম, 'আপনাকে শুতে দেখে তারপর আমি নিজের ঘরে যাব। আর জোড়হাত করে অনুরোধ করছি আর দরজা ধাক্কাবেন না। কাল ট্রেনে ঘুম হবে না জানি, তাই আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নিতে চাই।'

ভদ্রলোক কিন্তু খাটের দিকে যাবার কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। লণ্ঠনটা বাথরুমে রাখা হয়েছে, তাই ঘরে প্রায় আলো নেই বললেই চলে। বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ ; উত্তরের জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, তারই প্রতিফলিত আলোয় ধূর্জটিবাবুকে দেখতে পাচ্ছি। স্লিপিং সুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছেন। আমি আসবার সময় কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে এসেছি, অথচ ধূর্জটিবাবু দিব্যি গরমটরম কিচ্ছু না পরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক শেষটায় যদি সত্যিই একটা

গোলমেলে ব্যারাম বাধিয়ে বসেন তাহলে তো তাকে ফেলে আমার পক্ষে যাওয়াও মুশকিল হবে। বিদেশে বিভূঁইয়ে একজন বাঙালী বিপদে পড়লে আরেকজন তার জন্য কিছু না করে সরে পড়বে এ তো হতে পারে না।

আরেকবার তাঁকে বিছানায় শুতে বলেও যখন কোনো ফল হল না তখন বুঝলাম ওঁর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে জোর করে শুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। তিনি যদি অবাধ্য শিশু হতে চান, আমাকে তাঁর গুরুজনের ভূমিকা নিতেই হবে।

কিন্তু তাঁর হাতটা ধরা মাত্র আমার শরীরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া হল যে আমি চমকে তিন হাত পিছিয়ে গেলাম।

ধূর্জটিবাবুর শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। জ্যান্ত মানুষের শরীর এত ঠাণ্ডা হতে পারে এ আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

আমার অবস্থা দেখেই বোধহয় ধূর্জটিবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ভাব ফুটে উঠল। তাঁর কটা চোখ দিয়ে তিনি এখন আমার দিকে চেয়ে মিচকি মিচকি হাসছেন। আমি ধরা গলায় বললাম, 'আপনার কী হয়েছে বলুন তো।'

ধূর্জটিবাবু আমার দিক থেকে চোখ সরালেন না। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রায় মিনিট খানেক ধরে। অবাক হয়ে দেখলাম যে একটিবারও তাঁর চোখের পাতা পড়ল না। এরই মধ্যে তাঁর জিভটা বার কয়েক ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরোল। তারপর তিনি ফিস্‌ফিস্‌ গলায় বললেন, 'বাবা ডাকছেন—বালকিষণ ! বালকিষণ !...বাবা ডাকছেন...'

তারপর ভদ্রলোকের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। তিনি প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর করে নিজেকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে খাটের তলায় অন্ধকারে চলে গেলেন।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, হাত পা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ভদ্রলোক সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে যেটা অনুভব করছি সেটা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক মেশানো একটা অদ্ভুত ভয়াবহ ভাব।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর কাঁপুনিটা কমল, চিন্তাটা একটু পরিষ্কার হল। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং চোখের সামনে যা ঘটতে দেখেছি তা থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় সেটা একবার ভেবে দেখলাম। আজ বিকেলে আমার সামনে ধূর্জটিবাবু ইমলিবাবার পোষা কেউটেকে পাথরের ঘায়ে মেরে ফেললেন। তারপরেই ইমলিবাবা ধূর্জটিবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—একটা

বালকিষণ গেছে, তার জায়গায় আরেকটা বালকিষণ আসবে। সেই দ্বিতীয় বালকিষণ কি সাপ, না মানুষ ?

নাকি সাপ-হয়ে-যাওয়া মানুষ ?

ধূর্জটিবাবুর সর্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগগুলো কী ?

জিভের দাগটা কী ?

সেটা কি দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার আগের অবস্থা ?

তাঁর শরীর এত ঠাণ্ডা কেন ?

তিনি খাটে না শুয়ে খাটের তলায় ঢুকলেন কেন ?

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা জিনিস মনে পড়ে গেল। খগম ! ধূর্জটিবাবু জিগ্যেস করছিলেন খগমের কথা। নামটা চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি। এখন মনে পড়ে গেছে। ছেলেবেলায় পড়া মহাভারতের একটা গল্প। খগম নামে এক তপস্বী ছিলেন। তাঁর শাপে তাঁর বন্ধু সহস্রপাদ মুনি ঢোঁড়া সাপ হয়ে যান। খগম—সাপ—শাপ...সব মিলে যাচ্ছে। তবে তিনি হয়ে ছিলেন ঢোঁড়া, আর ইনি কী— ?

আমার দরজায় আবার কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। উপর দিকে নয়, তলার দিকে। চৌকাঠের ঠিক উপরে। একবার, দুবার, তিনবার। আমি বিছানা থেকে নড়লাম না। দরজা আমি খুলব না। আর না !

আওয়াজ বন্ধ হল, আমি দম বন্ধ করে কান পেতে আছি। এবার কানে এল শিসের শব্দ। দরজার কাছ থেকে ক্রমে সেটা দূরে সরে গেল। এবার আমার নিজের হৃৎস্পন্দন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ওটা কী ? একটা চিঁচিঁ শব্দ। একটা তীক্ষ্ণ মিহি আর্তনাদ। ইঁদুর নাকি ? এখানে ইঁদুর আছে। প্রথম রাত্রেই দেখেছি আমার ঘরে। পরদিন লছমনকে বলাতে সে রান্নাঘর থেকে একটা ইঁদুর-ধরা কলে জ্যান্ত ইঁদুর দেখিয়ে নিয়ে গেল। বলল 'চুহা' তো আছেই, 'ছুছন্দর'ও আছে।

আর্তনাদ ক্রমে মিলিয়ে এসে আবার নিস্তব্ধতা। দশ মিনিট গেল। ঘড়ি দেখলাম। পৌনে একটা। ঘুম যে কোথায় উধাও হয়েছে জানি না। জানালা দিয়ে বাইরের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চাঁদ বোধ হয় ঠিক মাথার উপরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ। পাশের ঘরে ধূর্জটিবাবু বারান্দায় যাবার দরজাটা খুলেছেন। আমার ঘরের যেদিকে জানালা, বারান্দায় যাবার দরজাও সেইদিকে। ধূর্জটিবাবুর ঘরেও তাই। বারান্দা থেকে নেমে বিশ হাত গেলেই গাছপালা শুরু হয়।

ধূর্জটিবাবু বারান্দায় বেরিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছেন তিনি ? কী মতলব তাঁর ? আমি একদৃষ্টে জানালার দিকে চেয়ে রইলাম।

শিসের শব্দ পাচ্ছি। সেটা ক্রমশ বাড়ছে। এবার সেটা ঠিক আমার জানালার বাইরে। জানালাটা ভাগ্যিস জালে ঢাকা, নইলে...

একটা কী যেন জিনিস জানালার তলার দিক থেকে ওপরে উঠছে। খানিকটা উঠে থেমে গেল। একটা মাথা। লণ্ঠনের আবছা আলোয় দুটো জ্বলজ্বলে কটা চোখ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে আছে।

প্রায় মিনিট খানেক এইভাবে থাকার পর একটা কুকুরের ডাক শোনা মাত্র মাথাটা বাঁ দিকে ঘুরে পরক্ষণেই আবার নিচের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুকুরটা ডাকছে। পরিত্রাহি চিৎকার। এবার একটা ঘুম-জড়ানো সাহেবী গলায় ধমকের আওয়াজ পেলাম। একটা কাতর গোঙানির সঙ্গে কুকুরের ডাকটা থেমে গেল। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। আমি মিনিট দশেক ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে শুয়ে রইলাম। কানের মধ্যে আজই রাত্রে শোনা একটা ছড়া বার বার ফিরে ফিরে আসছে—

সাপের ভাষা সাপের শিস
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস !
বালকিষণের বিষম বিষ
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস !

ক্রমে সেই ছড়াটাও মিলিয়ে এলো। বুঝতে পারলাম একটা ঝিমঝিমে অবসন্ন ভাব আমাকে ঘুমের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমটা ভাঙল সাহেবদের চেঁচামেচিতে। ঘড়িতে দেখি ছ'টা বাজতে দশ। কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গায়ে একটা গরম কাপড় চাপিয়ে বাইরে এসে শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকদের সাক্ষাৎ পেলাম। দুই যুবক, আমেরিকান—ডাক নাম ব্রুস আর মাইকেল—তাদের পোষা কুকুরটা কাল রাত্রে মারা গেছে। কুকুরটাকে নিজেদের ঘরেই নিয়ে শুয়েছিল, তবে ঘরের দরজা বন্ধ করেনি। ওরা সন্দেহ করেছে রাত্রে বিছে বা সাপ জাতীয় বিষাক্ত কিছু এসে কামড়ানোর ফলে এই দশা। মাইকেলের ধারণা কাঁকড়া বিছে কারণ শীতকালে সাপ বেরোয় না সেটা সকলেই জানে।

আমি আর কুকুরের উপর সময় নষ্ট না করে বারান্দার উল্টো দিকে ধূর্জটিবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। দরজা খোলা রয়েছে, ঘরের মালিক ঘরে নেই। লছমন রোজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল গরম করে। তাকে জিগ্যেস করতে সে বলল ধূর্জটিবাবুকে দেখেনি।

নানারকম আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে করে হোক ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতেই হবে। পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাবেন তিনি। কিন্তু চার

পাশের জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

সাড়ে দশটায় জীপ এলো। আমি ড্রাইভারকে বললাম পোস্ট অফিস যাব—জয়পুরে টেলিগ্রাম করতে হবে। ধূর্জটিবাবুর রহস্য সমাধান না করে ভরতপুর ছাড়া যাবে না।

মেজদাকে টেলিগ্রাম করে, ট্রেনের টিকিট পিছিয়ে, রেস্ট হাউসে ফিরে এসে শুনলাম তখনও পর্যন্ত ধূর্জটিবাবুর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আমেরিকান দুটি তাদের মরা কুকুরটাকে কবর দিয়ে এর মধ্যেই তলপি-তলপা গুটিয়ে উধাও।

সারা দুপুর রেস্ট হাউসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করলাম। জীপটা আমার আদেশ মতোই আবার বিকেলে এসে হাজির হল। একটা মতলব ছিল মাথায়; মন বলছিল সেটায় হয়ত ফল হবে। ড্রাইভারকে বললাম, 'ইমলিবাবার কাছে চল।'

কাল যেমন সময় এসেছিলাম, আজও প্রায় সেই একই সময়ে গিয়ে পৌঁছলাম বাবার কুটিরে। বাবা কালকের মতো ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শিষ্য আজ আরো দুটি বেড়েছে, তার মধ্যে একজন মাঝবয়সী, অন্যটি ছোকরা।

বাবা আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নমস্কার জানালেন। কালকের সেই ভস্মকরা চাহনির সঙ্গে আজকের চাহনির কোনো মিল নেই। আমি আর সময় নষ্ট না করে বাবাকে সরাসরি জিগ্যেস করলাম, আমার সঙ্গে কাল যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর কোনো খবর তিনি দিতে পারেন কিনা। বাবার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। বললেন,'খবর আছে বৈকি, তোমার দোস্ত্ আমার আশা পূর্ণ করেছে, সে আমার বালকিষণকে আবার ফিরিয়ে এনেছে।'

এই প্রথম চোখে পড়ল বাবার ডান পাশে রাখা রয়েছে একটা পাথরের বাটি। সেই বাটিতে যে সাদা তরল পদার্থটা রয়েছে সেটা দুধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সাপ আর দুধের বাটি দেখতেতো আর আমি এতদূর আসিনি। আমি এসেছি ধূর্জটিপ্রসাদ বসুর খোঁজে। লোকটাতো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। তার অস্তিত্বের একটা চিহ্নও যদি দেখতে পেতাম তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

ইমলিবাবা মানুষের মনের কথা বুঝে ফেলতে পারেন এটা আগেও দেখেছি। গাঁজার কলকেতে বড় রকম একটা টান দিয়ে সেটা পাশের প্রৌঢ় চেলার হাতে চালান দিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুকেতো তুমি আর আগের মতো ফিরে পাবে না, তবে তার স্মৃতিচিহ্ন সে রেখে গেছে। সেটা তুমি বালকিষণের ডেরার পঞ্চাশ পা দক্ষিণে পাবে। সাবধানে যেও, অনেক কাঁটাগাছ পড়বে পথে।'

বাবার কথা মতো গেলাম বালকিষণের গর্তের কাছে। সে গর্তে এখন সাপ আছে কিনা সেটা জানার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আকাশে ডুবু ডুবু

সূর্যের দিকে চেয়ে হিসেব করে দক্ষিণ দিক ধরে এগিয়ে গেলাম। ঘাস, কাঁটাঝোঁপ, পাথরের টুক্‌রো আর চোরকাঁটার ভেতর দিয়ে গুনে গুনে পঞ্চাশ পা এগিয়ে গিয়ে একটা অর্জুন গাছের গুঁড়ির ধারে যে জিনিসটা পড়ে থাকতে দেখলাম, সেরকম জিনিস এই কয়েক মিনিট আগেই ইমলিবাবার কুটিরে দড়ি থেকে ঝুলছে দেখে এসেছি।

সেটা একটা খোলস। সারা খোলসের উপর রুহিতন মার্কা নকশা।

সাপের খোলস কি? না, তা নয়। সাপের শরীর কি এত চওড়া হয়? আর তার দুপাশ দিয়ে কি দুটো হাত, আর তলা দিয়ে কি এক জোড়া পা বেরোয়?

আসলে এটা একটা মানুষের খোলস। সেই মানুষটা এখন আর মানুষ নেই। সে এখন ওই গর্তটার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে জাতে কেউটে, তার দাঁতে বিষ।

ওই যে তার শিস শুরু হল। ওই যে সূর্য ডুবল। ওই যে ইমলিবাবা ডাকছে—'বালকিষণ...বালকিষণ...বালকিষণ...'

রতনবাবু আর সেই লোকটা

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক ওদিক দেখে রতনবাবুর মনে একটা খুশির ভাব জেগে উঠল। জায়গাটা তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। স্টেশনের পিছনে শিরীষ গাছটা কেমন মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, তার ডালে আবার একটা লাল ঘুড়ি আটকে রয়েছে। লোকজনের মধ্যে ব্যস্ততার ভাব নেই, বাতাসে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ—সব মিলিয়ে দিব্যি মনোরম পরিবেশ।

সঙ্গে একটা ছোট হোল্ডল আর চামড়ার একটা ছোট সুটকেস। কুলির দরকার নেই; রতনবাবু সেগুলো দুহাতে তুলে নিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাইরে সাইকেল-রিক্সা পেতে কোনো অসুবিধা হল না। ডোরাকাটা হাফপ্যান্ট পরা ছোক্‌রা চালক জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাবেন বাবু?'

রতনবাবু বললেন, 'নিউ মহামায়া হোটেল—জান?'

ছোক্‌রা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বলল, 'উঠুন।'

ভ্রমণ জিনিসটা রতনবাবুর একটা বাতিক বলেই বলা যেতে পারে। সুযোগ পেলেই তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও ঘুরে আসেন। অবিশ্যি সুযোগ যে সব সময় আসে তা নয়, কারণ রতনবাবুর একটা চাকরি আছে। কলকাতার জিয়োলজিকাল সার্ভের আপিসে তিনি একজন কেরানি। আজ চব্বিশ বছর ধরে তিনি এই চাকরি করছেন। তাই বাইরে বেড়িয়ে আসার মতো সুযোগ তাঁর বছরে একবারই আসে। পুজোর ছুটির সঙ্গে তাঁর বাৎসরিক পাওনা ছুটি জুড়ে নিয়ে তিনি প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও ভ্রমণ করে আসেন।

এই বেড়ানোর ব্যাপারে রতনবাবু সঙ্গে আর কাউকে নেন না, বা নেবার ইচ্ছেটাও তাঁর মনে জাগে না। প্রথম প্রথম যে সঙ্গীর অভাব বোধ করতেন না তা নয়; তাঁর পাশের টেবিলের কেশববাবুর সঙ্গে এককালে তাঁর এই নিয়ে কথা

হয়েছিল, মহালয়ার কয়েকদিন আগে। রতনবাবু তখন সবে ছুটির প্ল্যান করেছেন; তিনি বলেছিলেন, 'আপনিও তো মশাই একা মানুষ—চলুন না এবার পুজোয় দুজনে একসঙ্গে কোথাও ঘুরে-টুরে আসি।'

কেশববাবু তাঁর কলমটা কানে গুঁজে হাত দুটোকে জড়ো করে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আপনার পছন্দর সঙ্গে আমার পছন্দ কি মিলবে? আপনি যাবেন সব উদ্ভট নাম না-জানা জায়গায়। সেখানে না আছে দেখবার কিছু না আছে থাকা-খাওয়ার সুবিধে। আমায় মাপ করবেন। আমি যাচ্ছি হরিনাভিতে আমার ভায়রাভাইয়ের কাছে।'

ক্রমে রতনবাবু বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে বন্ধু পাওয়া খুবই শক্ত। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপারটা সাধারণ লোকের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কাজেই বন্ধু পাওয়ার আশাটা পরিত্যাগ করাই ভালো।

সত্যিই রতনবাবুর স্বভাব চরিত্রে বেশ একটা অভিনবত্ব ছিল। যেমন এই চেঞ্জে যাওয়ার ব্যাপারটা। কেশববাবু মোটেই ভুল বলেননি। লোকে সচরাচর যেসব জায়গায় চেঞ্জে যায়, রতনবাবু সেদিকে দৃষ্টিই দিতেন না। তিনি বলতেন, 'আরে মশাই—পুরীতে সমুদ্র আছে, জগন্নাথের মন্দির আছে; দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়; হাজারিবাগে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, রাঁচির কাছে হুড্রু ফল্‌স আছে এসব কথা তো সকলেই জানে। আর লোকমুখে একটা জিনিসের বর্ণনা বার বার শোনা মানে তো সে জিনিস প্রায় দেখাই হয়ে গেল।'

রতনবাবুর যেটা দরকার সেটা হল রেলের স্টেশনের ধারে একটি ছোট্ট শহর। ব্যস—আর কিছু না! প্রতি বছরই ছুটির আগে টাইম টেবিল খুলে, খুব বেশি দূরে নয় এমন একটি জায়গার নাম বের করে তিনি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় গেলেন, কী দেখলেন, তা কেউ জিগ্যেস করে না, বা কাউকে তিনি বলেনও না। এমন অনেকবার হয়েছে, যে যেখানে গেছেন সে জায়গার নাম তিনি আগে শোনেনইনি। আর যেখানেই গেছেন, সেখানেই এমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছে। অন্যদের চোখে হয়ত এসব জিনিস খুবই সামান্য—যেমন রাজাভাতখাওয়ায় একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ—যেটা একটা কুলগাছ আর একটা নারকেল গাছকে পাকিয়ে উঠেছে, মহেশগঞ্জে একটা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ, ময়নাতে একটা মিষ্টির দোকানের ডালের বরফি...

এবারে রতনবাবু যেখানে এসেছেন সে জায়গাটার নাম সিনি। টাটানগর থেকে পনেরো মাইল দূরে এই শহর। এ জায়গাটা অবশ্য টাইম টেবল থেকে বার করেননি তিনি। আপিসের অনুকূল মিত্তির বলেন জায়গাটার কথা। নিউ মহামায়া হোটেলের নামটাও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

রতনবাবুর চোখে হোটেলটাকে বেশ ভালোই বলে মনে হল। ঘরটা

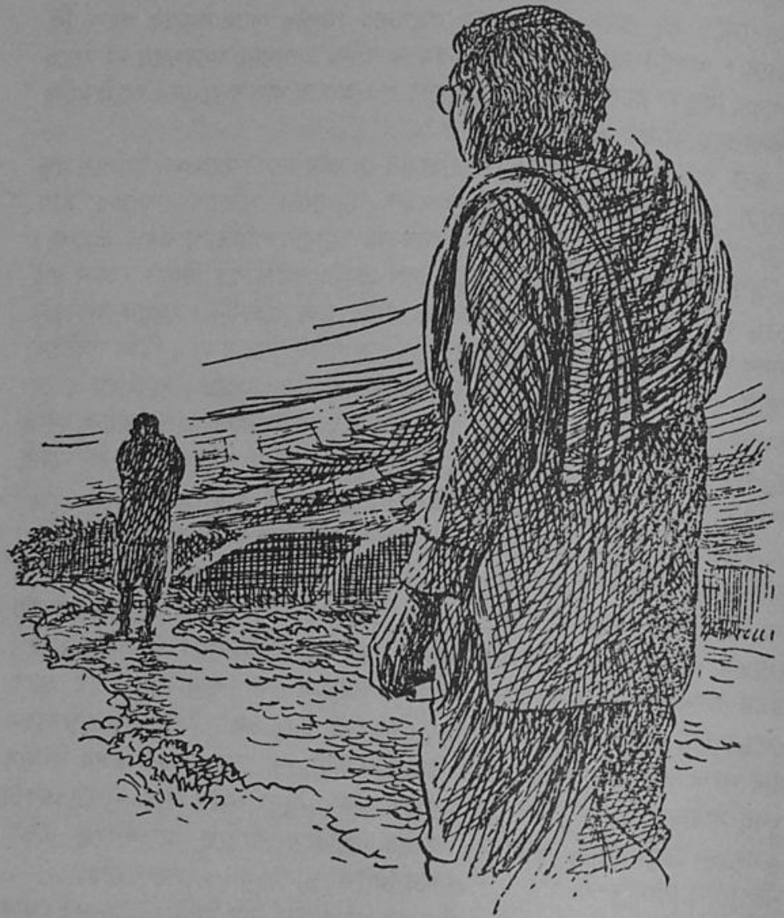

ছোট—তবে তাতে কিছু এসে যায় না। পূব দক্ষিণ দুদিকে দুটো জানালা রয়েছে—তাই দিয়ে বেশ চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। পঞ্চা চাকরটিকেও বেশ অমায়িক বলে মনে হল। রতনবাবু শীত-গ্রীষ্ম দুবেলা গরম জলে স্নান করেন, পঞ্চা তাঁকে আশ্বাস দিল তার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। হোটেলের রান্নাটা মোটামুটি চলনসই, এবং সেটাই যথেষ্ট, কারণ খাওয়ার ব্যাপারেও রতনবাবু মোটেই খুঁতখুঁতে নন। শুধু একটি বায়না তাঁর আছে—ভাত আর হাতের রুটি—এ দুটোই একসঙ্গে না হলে তাঁর খাওয়া হয় না। মাছের ঝোলের সঙ্গে ভাত, আর ডাল তরকারির সঙ্গে রুটি—এটাই তাঁর রেয়াজ। হোটেলে এসেই পঞ্চাকে তিনি কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন, এবং পঞ্চাও সে খবর ম্যানেজারকে পৌঁছে দিয়েছে।

নতুন জায়গায় এলে প্রথম দিনই বিকেলে হেঁটে না বেরোনো পর্যন্ত রতনবাবু সোয়াস্তি বোধ করেন না।

সিনিতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। চারটের সময় পঞ্চার এনে দেওয়া চা খেয়েই রতনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

শহর থেকে বেরোলেই খোলা অসমতল প্রান্তর। তার মধ্যে দিয়ে আবার এদিক ওদিক হাঁটা-পথ চলে গেছে। এই পথের একটা দিকে মাইলখানেক গিয়ে রতনবাবু একটা ভারী মনোরম জিনিস আবিষ্কার করলেন। একটা ছোট্ট ডোবা পুকুর,—তার মধ্যে কিছু শালুক ফুটে আছে, আর তার চারিদিকে অজস্র পাখির জটলা। বক, ডাহুক, কাদাখোঁচা, মাছরাঙা—এগুলো রতনবাবুর চেনা; বাকিগুলো এই প্রথম তিনি দেখলেন।

প্রতিদিন বিকেলবেলাটা এই ডোবার ধারে বসেই হয়ত রতনবাবু বাকি ছুটিটা কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আরো কিছু আবিষ্কারের আশায় রতনবাবু অন্য আরেকটা পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

মাইল খানেক যাবার পর পথে এক পাল ছাগল পড়ার দরুন তাঁর হাঁটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হল। রাস্তা খালি হবার পর আরো মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই দেখলেন সামনে একটা কাঠের পুল দেখা যাচ্ছে। আরো এগিয়ে গিয়ে বুঝলেন সেটা একটা ওভারব্রিজ। তার নিচে দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন। পুবদিকে দূরে স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে, আর পশ্চিমদিকে যতদূর চোখ যায় সোজা চলে গেছে সমান্তরাল দুটো লোহার পাত। এখন যদি হঠাৎ একটা ট্রেন এসে পড়ে, আর ব্রিজের তলা দিয়ে সেটা যদি যায় তাহলে কী অদ্ভুত ব্যাপার হবে, সেটা ভাবতেই রতনবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

একদৃষ্টে রেললাইনের দিকে দেখছিলেন বলেই বোধহয় কখন যে আরেকটি লোক এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে সেটা রতনবাবু খেয়াল করেননি, তাই পাশে

তাকাতেই তাঁকে চমকে উঠতে হল।

লোকটির পরনে ধুতি, সার্ট, কাঁধে একটা নস্যির রঙের র‍্যাপার, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, চোখে বাইফোক্যাল চশমা। রতনবাবুর কেমন জানি খট্‌কা লাগল। এঁকে কি আগে দেখেছেন কোথাও? চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? মাঝারি হাইট, গায়ের রংও মাঝারি, চোখের দৃষ্টিতে কেমন উদাস ভাবুক ভাবুক ভাব। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয় নিশ্চয়ই। চুলে বিশেষ পাক ধরেনি। অন্তত সন্ধ্যার আলোতে তো তাই মনে হয়।

আগন্তুক একটা ঠাণ্ডা হাসি হেসে রতনবাবুকে নমস্কার করলেন। রতনবাবু হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ বুঝে ফেললেন কেন তাঁর খট্‌কা লাগছিল। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হবার কারণ আর কিছুই না—এই ধাঁচের একটি চেহারা রতনবাবু বহুবার দেখেছেন—এবং সেটা তাঁর আয়নায়। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে তাঁর নিজের চেহারার আশ্চর্য মিল। মুখের চৌকোনা ভাব, চুলের টেরি, গোঁফের ধাঁচ, থুতনির মাঝখানে খাঁজ, কানের লতি—এসবই প্রায় হুবহু এক। তবে গায়ের রং আগন্তুকের যেন একটু বেশি ময়লা, ভুরু একটু বেশি ঘন, আর মাথার পিছনের চুল যেন একটু বেশি লম্বা।

এবার আগন্তুকের গলার স্বর শুনেও রতনবাবু চমকে উঠলেন। একবার তাঁর পাড়ার ছেলে সুশান্ত একটা টেপ রেকর্ডারে রতনবাবুর গলা রেকর্ড করে শুনিয়েছিল। সে গলা আর এই লোকটির গলায় কোনো তফাত নেই বললেই চলে।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম মণিলাল মজুমদার। আপনি তো বোধহয় নিউ মহামায়া হোটেলে উঠেছেন, তাই না?'

রতনলাল—মণিলাল। নামেও কেমন আশ্চর্য মিল। রতনবাবু কোনোরকমে অবাক ভাবটা কাটিয়ে তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন।

আগন্তুক বললেন, 'আপনার বোধহয় আমাকে মনে পড়বে না—আমি কিন্তু এর আগেও আপনাকে দেখেছি।'

'কোথায় বলুন তো?'

'আপনি গত পুজোয় ধুলিয়ান যাননি?'

রতনবাবু ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'আপনিও সেখানে গেসলেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিবারই পুজোয় কোথাও না কোথাও যাই। একা মানুষ, বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই। আর নতুন নতুন জায়গায় একা একা বেড়াতে দিব্যি লাগে। সিনির কথাটা আমার আপিসের এক সহকর্মী আমাকে বলেন। বেশ জায়গা—কী বলেন?'

রতনবাবু ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। কেমন যেন অবিশ্বাস

আর অসোয়াস্তি মেশানো একটা ভাব বোধ করছেন তিনি।

'ও দিকের পুকুরটা দেখেছেন—যার পাশে পাখির জটলা হয় বিকেলবেলার দিকটা?' মণিলালবাবু জিগ্যেস করলেন।

রতনবাবু বললেন হ্যাঁ, দেখেছেন।

'মনে হল কিছু ভিন্‌দেশের পাখিও জড়ো হয়েছে ওখানে। কিছু পাখি দেখলাম যা বাংলাদেশে আগে দেখিনি। আপনার কী মনে হল?'

এতক্ষণে রতনবাবু খানিকটা স্বাভাবিক বোধ করছেন। বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। আমিও কতগুলো পাখি দেখে চিনতে পারিনি।'

দূর থেকে একটা গুম্ গুম্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেন আসছে। পুব দিকে চেয়ে দেখলেন দূরে সার্চলাইট দেখা যাচ্ছে। আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে। রতনবাবু আর মণিলালবাবু দুজনেই ব্রিজের রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিরাট শব্দ করে ব্রিজটাকে থর থর করে কাঁপিয়ে ট্রেনটা উল্টো দিকে চলে গেল। দুজন ভদ্রলোকই হেঁটে ব্রিজটার উল্টোদিকে গিয়ে যতক্ষণ না ট্রেনটা অদৃশ্য হয় ততক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন। রতনবাবুর মনে ছেলেমানুষী রোমাঞ্চের ভাব জেগে উঠেছে। মণিলালবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! এত বয়স হল, তবু ট্রেন দেখার আনন্দটা গেল না।'

বাড়ি ফেরার পথে রতনবাবু জানলেন যে মণিলালবাবু তিনদিন হল সিনিতে এসেছেন, আর কালিকা হোটেলে উঠেছেন। কলকাতাতেই তাঁর পৈতৃক বাড়ি, কাজও করেন তিনি কলকাতার এক সওদাগরী আপিসে। মাইনের কথাটা কেউ কাউকে সাধারণত জিগ্যেস করে না, কিন্তু রতনবাবু একটা অদম্য ইচ্ছের ফলে লজ্জার মাথা খেয়ে সেটা জিগ্যেস করে ফেললেন। উত্তর যা পেলেন তাতে তাঁর কপালে ঘাম ছুটে গেল। এমনও কি সম্ভব? মণিলালবাবু আর রতনবাবুর মাইনে এক—দুজনেই পান চারশো সাঁইত্রিশ টাকা, দুজনেই ঠিক একই বোনাস পেয়েছেন পুজোয়।

লোকটা যে তাঁর নাড়ীনক্ষত্র কোনো ফিকিরে আগে থেকেই জেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা ধাপ্পাবাজির খেলা খেলছে, একথাটা রতনবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রথমত, তাঁর রোজকার জীবনে কী ঘটছে না-ঘটছে তা নিয়ে কেউ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। তিনি নিজের তালে নিজেই ঘোরেন। আপিসের বাইরে বাড়ির চাকর ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কারুর বাড়িতে গিয়ে কখনো আড্ডা মারেন না। মাইনের ব্যাপারটা না হয় বাইরে জানাজানি হতে পারে, কিন্তু তিনি রাত্রে কখন ঘুমোন, কী খেতে ভালোবাসেন, কোন খবরের কাগজটা পড়েন, কোন থিয়েটার বা কোন বাংলা সিনেমা তিনি ইদানীং দেখেছেন—এসব তো তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না। অথচ এর সব কিছুই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে

হুবহু মিলে যাচ্ছে।

রতনবাবু কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে মণিলালবাবুকে বলতে পারলেন না। সারা রাস্তা তিনি শুধু মণিলালবাবুর কথাই শুনলেন, আর নিজের সঙ্গে মিল দেখে বারবার অবাক হলেন, চমকে উঠলেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি এগিয়ে গিয়ে কিছুই বললেন না।

রতনবাবুর হোটেলটাই আগে পড়ে। হোটেলের সামনে এসে মণিলালবাবু বললেন, 'আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া কেমন ?'

রতনবাবু বললেন, 'মাছের ঝোলটা মন্দ করে না। বাকি চলনসই।'

'আমার হোটেলে রান্নাটা আবার তেমন সুবিধের নয়। শুনছি এখানে জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নাকি ভালো লুচি আর ছোলার ডাল করে। আজ রাতের খাওয়াটা সারলে কেমন হয় ?'

রতনবাবু বললেন, 'বেশতো আমার আপত্তি নেই। ধরুন এই আটটা নাগাদ ?'

'ঠিক আছে। আমি ওয়েট করব আপনার জন্য। তারপর এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।'

মণিলালবাবু চলে যাবার পর রতনবাবু হোটেলে না ঢুকে কিছুক্ষণ বাইরে রাস্তায় পায়চারি করলেন। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার—এতই পরিষ্কার যে তারার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে যাওয়া ছায়াপথটাকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য ! এতকাল রতনবাবুর আপসোস ছিল যে তাঁর সঙ্গে মনের আর মতের মিল হয় এমন কোনো বন্ধু তিনি খুঁজে পাননি ; অথচ এই সিনিতে এসে হঠাৎ এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যাকে তাঁরই একটি ডুপ্লিকেট সংস্করণ বলা যেতে পারে। চেহারায় খানিকটা তফাত থাকলেও, স্বভাবে আর রুচিতে এমন মিল যমজ ভাইদের মধ্যেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

তার মানে কি এতদিনে তাঁর বন্ধুর অভাব মিটল ?

রতনবাবু এ প্রশ্নের উত্তর চট্ করে খুঁজে পেলেন না। হয়ত মণিলালবাবুর সঙ্গে আরেকটু মিশলে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা জিনিস তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর একা ভাবটা যেন কেটে গেছে। এ পৃথিবীতে ঠিক তাঁরই মতো আরেকটি লোক এতদিন ছিল, আর তিনি আকস্মিকভাবে তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেছেন।

জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি বসে খেতে খেতে রতনবাবু লক্ষ করলেন যে তাঁরই মতো মণিলালবাবুও বেশ পরিষ্কার করে চেটেপুটে খেতে ভালোবাসেন, তাঁরই মতো খাবার মাঝখানে জল খান না, তাঁরই মতো ডালের মধ্যে পাতি লেবু কচলে নেন। সব খাবার পরে দই না খেলে রতনবাবুর চলে না, মণিলালবাবুরও না।

খাবার সময় রতনবাবুর একটু অসোয়াস্তি লাগছিল এই কারণে যে তাঁর সব সময়ই মনে হচ্ছিল যে অন্য টেবিলের লোকেরা তাঁদের দিকে ফিরে ফিরে দেখছে। এরা কি তাঁদের দুজনের মধ্যে মিলটা লক্ষ করেছে ? এই মিলটা কি এতই স্পষ্ট যে বাইরে লোকের চোখেও ধরা পড়ে ?

খাবার পরে রতনবাবু আর মণিলালবাবু চাঁদনি রাতে রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। একটা প্রশ্ন রতনবাবুর মাথায় অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছিল, এক ফাঁকে সেটা বেরিয়ে পড়ল। জিগ্যেস করলেন, 'আপনার কি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে ?'

মণিলালবাবু হেসে বললেন, 'এই পেরোল বলে। এগারোই পৌষে পঞ্চাশ কম্প্লিট করব।'

রতনবাবুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। দুজনের জন্মও একই দিনে—১৩২৩ সালের এগারোই পৌষ !

আধঘন্টাখানেক পায়চারি করার পর বিদায় নেবার সময় মণিলালবাবু হেসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ পেলুম। আমার সঙ্গে সহজে কারুর একটা বনে না—কিন্তু আপনার বেলা সে কথাটা খাটে না। বাকি ছুটিটা বেশ আনন্দে কাটবে বলে মনে হচ্ছে।'

অন্যান্য দিন রতনবাবু দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। সঙ্গে দু-একটি বাংলা মাসিকপত্রিকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ পাতা উল্টানোর পর আপনা থেকেই ঘুমে চোখ বুজে আসে। শোয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচটা পাওয়া যায়, সেটা নেভানোর মিনিট খানেকের মধ্যেই রতনবাবুর নাক ডাকতে শুরু করে। আজ কিন্তু তিনি দেখলেন যে তাঁর ঘুম আসতে চাইছে না। পড়বারও ইচ্ছে নেই। পত্রিকাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পাশের টেবিলে রেখে দিলেন।

মণিলাল মজুমদার...

রতনবাবু কোথায় যেন পড়েছিলেন যে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যেও কোথাও এমন কোনো দুজনকে পাওয়া যাবে না যাদের চেহারা হুবহু একরকম। অথচ চোখ কান নাক হাত পা ইত্যাদির সংখ্যা সকলেরই এক। চেহারার হুবহু মিল না হয় অসম্ভব, কিন্তু দুজনের মনের এই আশ্চর্য মিল কি সম্ভব ? শুধু মন কেন—বয়স, পেশা, গলার স্বর, হাঁটা ও বসার ভঙ্গি, চোখের চশমার পাওয়ার ইত্যাদি আরো অনেক কিছু হুবহু মিলে যাচ্ছে। ভাবলে মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু সেটাও যে সম্ভব হয়েছে তার প্রমাণতোগত চার ঘন্টায় রতনবাবু অনেকবার পেয়েছেন।

রাত বারোটা নাগাদ রতনবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের কুঁজো কাত করে আঁজলা করে খানিকটা জল নিয়ে মাথায় দিলেন। তাঁর মাথা গরম হয়ে গেছে। এ

অবস্থায় ঘুম আসবে না। ভিজে মাথায় আলতো করে গামছাটা একবার বুলিয়ে নিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুলেন। বালিশটা ভিজে গেল। ভালোই। যতক্ষণ না শুকোয় ততক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা প্যাঁচা বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হোটেলের পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানায় পড়েছে ; কখন জানি আপনা থেকেই রতনবাবুর মন থেকে ভাবনা মুছে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

রাত্রে ঘুমাতে দেরি হওয়ার ফলে রতনবাবুর সকালে ঘুম ভাঙতে প্রায় আটটা হয়ে গেল। ন'টায় মণিলালবাবুর আসার কথা। আজ মঙ্গলবার। মাইল খানেক দূরে একটা জায়গায় আজ হাট বসবে। গতকাল খেতে খেতে দুজনে প্রায় একসঙ্গেই হাটে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কেনার বিশেষ কিছু নেই, খালি ঘুরে দেখা আর কী।

চা খেতে খেতেই প্রায় ন'টা বাজল। সামনে প্লেটে রাখা মৌরির খানিকটা মুখে পুরে হোটেল থেকে বাইরে বেরোতেই রতনবাবু দেখলেন মণিলালবাবু হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসে মণিলালবাবুর প্রথম কথা হল 'আপনার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল সে কথা ভাবতে ভাবতে কাল ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল। উঠে দেখি আটটা বাজতে পাঁচ। এমনিতে ঠিক ছটায় উঠি।'

রতনবাবু একথার কোনো জবাব দিলেন না। দুজনে হাটের দিকে রওনা দিলেন। পাড়ার কতগুলো ছোকরা জটলা করছিল ; রতনবাবুরা তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের মধ্যে একজন টিটকিরির সুরে বলে উঠল, 'মানিকজোড় !' রতনবাবু যথাসম্ভব কথাটাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলেন। মিনিট কুড়ির মধ্যে দুজনে হাটে পৌঁছে গেলেন।

বেশ গমগমে হাট। ফলমূল শাকসবজি তরিতরকারি থেকে বাসনকোসন হাঁড়িকুঁড়ি জামাকাপড় মুরগিছাগল ইত্যাদি সব কিছুরই দোকান বসেছে। ভিড়ও হয়েছে বেশ। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এ দোকান সে দোকান দেখতে দেখতে রতনবাবু আর মণিলালবাবু এগিয়ে গেলেন।

ওটা কে ? পঞ্চা না ? রতনবাবু কেন জানি তাঁর হোটেলের চাকরটাকে সামনে ভিড়ের মধ্যে দেখে তাঁর দৃষ্টি নামিয়ে মুখটাকে আড়াল করে দিলেন। ছোকরাদের 'মানিকজোড়' কথাটা কানে যাওয়া অবধি তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে লোকেরা মনে মনে হাসে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় আচমকা রতনবাবুর মনে একটা চিন্তার উদয় হল। হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে তিনি একাই ছিলেন ভালো। বন্ধুর তাঁর

কোনো দরকার নেই। আর বন্ধু হলেও, সে লোক যেন মণিলালবাবুর মতো না হলেই ভালো। মণিলালবাবুর সঙ্গে তিনি যতবারই কথা বলেছেন, ততবারই তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। প্রশ্ন করলে কী উত্তর পাওয়া যাবে সেটা যেন আগে থেকেই জানা, তর্ক করারকোনো সুযোগ নেই, আলোচনার প্রয়োজন নেই, ঝগড়াঝাঁটির কোনো সম্ভাবনাই নেই। এটা কি বন্ধুত্বের লক্ষণ ? তাঁর অফিসের কার্তিক রায়ের সঙ্গে মুকুন্দ চক্কোত্তিরতো গলায় গলায় ভাব ; কিন্তু তা বলে কি দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় না ? আপাতত হয়। কিন্তু তবু তো তারা বন্ধু, সত্যি করেই বন্ধু।

সব কিছু মিলিয়ে তাঁর বার বার মনে হতে লাগল যে মণিলাল মজুমদার লোকটি তাঁর জীবনে না এলেই যেন ভালো ছিল। ঠিক একই রকম দুজন লোক যদি জগতে থাকেও, তাদের পরস্পরের কাছাকাছি আসাটা কোনো কাজের কথা নয়। সিনি থেকে কলকাতা ফিরে গিয়েও মণিলালবাবুর সঙ্গে হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে একথা ভাবতেই রতনবাবু শিউরে উঠলেন।

একটা দোকানে বাঁশের লাঠি বিক্রি হচ্ছিল। রতনবাবুর অনেকদিনের সখ একটা লাঠি কেনার, কিন্তু মণিলালবাবু দর করছেন দেখে রতনবাবু অনেক কষ্টে তাঁর লোভ সংবরণ করলেন। শেষটায় দেখেন কী মণিলালবাবু নিজেই একটার জায়গায় দুটো লাঠি কিনে তার একটি তাঁকে উপহার দিলেন। দেবার সময় আবার বললেন, 'এই সামান্য লাঠিটা বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে নিতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।'

হাটের পর হোটেলের দিকে ফেরার পথে মণিলালবাবু অনেক কথা বললেন। তাঁর ছেলেবেলার কথা, তাঁর মা বাবার কথা, তাঁর ইস্কুল কলেজের কথা। রতনবাবুর শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে তাঁর নিজের জীবনকথাই যেন কেউ তাঁকে গড়গড় করে শুনিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলবেলা চা খেয়ে দুজনে মাঠের মাঝখানের পথ দিয়ে ব্রিজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রতনবাবুর মাথায় ফন্দিটা এল। কথা তাঁকে বেশি বলতে হচ্ছে না, তাই মাথাটা কাজ করছিল ভালো। দুপুর থেকেই মনে হচ্ছে এই লোকটাকে হটাতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু উপায়টা মাথায় আসছিল না। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘটা চোখে পড়তেই রতনবাবু উপায়টা যেন তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত দৃশ্য হিসাবে দেখতে পেলেন।

তিনি দেখলেন যে তাঁরা দুজন যেন ওভারব্রিজের রেলিং-এর ধারটায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে পশ্চিম দিক থেকে ছ'টার মেল ট্রেনটা ঝড়ের মতোএগিয়ে আসছে। এঞ্জিনটা যখন বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন তিনি মণিলালবাবুর কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে—

রতনবাবু হাঁটা অবস্থাতেই চোখ বন্ধ করলেন ! তারপর চোখ খুলে আড়চোখে একবার মণিলালবাবুর দিকে দেখে নিলেন । মণিলালবাবুকে কিছুমাত্র চিন্তিত বলে মনে হল না । কিন্তু দুজনের মধ্যে যদি এতই মিল হয়, তাহলে মণিলালবাবুও হয়ত মনে মনে তাঁকে হটাবার কোনো ফন্দি আঁটছেন !

কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে তা মনে হল না । সত্যি বলতে কি ভদ্রলোক দিব্যি মনের আনন্দে গুন গুন করে গান গাইছেন । হিন্দি সিনেমার এই গানের সুরটা রতনবাবুও মাঝে মাঝে গুন গুন করে থাকেন ।

পশ্চিমের কালো মেঘটা এগিয়ে এসেছে, সূর্য মেঘের পিছনে ঢাকা । বোধহয় আর কয়েক মিনিটেই অস্ত যাবে । রতনবাবু চারিদিকে চেয়ে ত্রিসীমানায় আর অন্য কোনো মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলেন না । ভালোই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যেত ।

আশ্চর্য—একটা মানুষকে খুন করার কথা ভেবেও রতনবাবু নিজেকে দোষী মনে করতে পারলেন না । মণিলালবাবুর যদি কোনো বিশেষত্ব থাকত—এমনকি তাঁর স্বভাব চরিত্র যদি রতনবাবুর চেয়ে সামান্য অন্য রকমও হত—তাহলে রতনবাবু তাঁকে মারবার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না । রতনবাবুর বিশ্বাস হয়েছে যে একই রকম দুজন লোকের একসঙ্গে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই । তিনি নিজে আছেন, নিজে থাকবেন এটাই যথেষ্ট । মণিলালবাবু থেকেও যদি তাঁর থেকে দূরে থাকতে পারতেন—যেমন এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন—তাতে তাঁর আপত্তি করার কিছু ছিল না । কিন্তু এখন এই আলাপের পর সেটা সম্ভব নয়, তাই তাঁকে সরিয়ে ফেলা নেহাতই দরকার ।

দুই ভদ্রলোক এসে ওভারব্রিজটায় পৌঁছলেন ।

'বেশ গুমোট করেছে,' মণিলালবাবু বললেন, 'রাত্রের দিকে বৃষ্টিও হতে পারে । আর তার মানেই কাল থেকে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়বে ।'

রতনবাবু এই ফাঁকে একবার ঘড়িটা দেখে নিলেন । ছ'টা বাজতে বারো মিনিট । ট্রেনটা নাকি খুব টাইমে যাতায়াত করে । আর বেশিক্ষণ নেই । রতনবাবু তার জড় ভাবটা ঢাকবার জন্য একটা হাই তুলে বললেন, 'বৃষ্টি হলেও ঘণ্টা চার-পাঁচের আগে কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না ।'

'সুপুরি খাবেন ?'

মণিলালবাবু পকেট থেকে একটা গোল টিনের কৌটো বার করে ঢাকনা খুলে রতনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন । রতনবাবুর পকেটেও একটা কৌটোতে সুপুরি ছিল । তিনি সেটা আর বার না করে, সেটার কথা উল্লেখও না করে মণিলালবাবুর কৌটো থেকে একটা সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিলেন ।

আর প্রায় সেই মুহূর্তেই ট্রেনের আওয়াজটা শোনা গেল ।

আজ ট্রেনটা ছ'টার একটু আগেই চলে এসেছে ।

মণিলালবাবু রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সাত মিনিট বিফোর টাইম ।'

পশ্চিমে মেঘ থাকার জন্য আজ অন্যদিনের চেয়ে চারিদিক একটু বেশি অন্ধকার, তাই হেডলাইটের আলোটা আরো বেশি-উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে । এখনো অনেক দূরে ট্রেন, তবে আলোটা দ্রুত বেড়ে চলেছে । একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে চোখে জল এসে যায় ।

'ক্রিংক্রিং !'

সাইকেল চেপে একটা লোক রাস্তা দিয়ে ব্রিজের দিকে এসেছে । সর্বনাশ ! লোকটা থামবে নাকি ?

না, রতনবাবুর আশঙ্কা ভুল । লোকটা তাঁদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

ট্রেনটা প্রচণ্ড দাপটে এগিয়ে এসেছে । চোখ-ঝলসানো হেডলাইটে দূরত্ব আন্দাজ করা কঠিন । আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওভারব্রিজ কাঁপতে শুরু করবে ।

ট্রেনের শব্দে কান পাতা যায় না ।

মণিলালবাবু রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে চেয়ে আছে । একটা বিদ্যুতের চমক—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রতনবাবু তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দুহাত দিয়ে মণিলালবাবুর পিঠে মারলেন ধাক্কা । তার ফলে মণিলালবাবুর দেহটা উঁচু কাঠের রেলিং-এর উপর দিয়ে উল্টে সটান চলে গেল নিচে একেবারে রেল লাইনের দিকে । ঠিক সেই মুহূর্তেই রতনবাবু বুঝতে পারলেন যে ওভারব্রিজটা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে ।

রতনবাবু আজ আর ট্রেন চলে যাবার দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষা করলেন না । কাঠের ব্রিজটারমতোই তাঁর মধ্যেও একটা কাঁপুনি শুরু হয়েছে । পশ্চিমের মেঘটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক ।

রতনবাবু র‍্যাপারটা বেশ ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলেন ।

বৃষ্টির প্রথম পশলাটা এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় শেষের রাস্তাটুকু প্রায় দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রতনবাবু হোটেলে ঢুকলেন ।

ঢুকেই তাঁর কেমন যেন খট্‌কা লাগল ।

এটা কোথায় এলেন তিনি ? মহামায়া হোটেলের সামনে ঘরটা তো এরকম নয় । এরকম টেবিল, এরকমভাবে চেয়ার সাজানো, দেয়ালে এরকম ছবি... !

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেয়ালে একটা কাঠের বোর্ড তাঁর চোখে

পড়ল। কী বিদঘুটে ভুল রে বাবা! এ যে কালিকা হোটেলে এসে ঢুকেছেন তিনি! এইখানেই তো মণিলালবাবু ছিলেন না?

'বৃষ্টিতে ভিজলেন নাকি?'

কে একজন প্রশ্ন করল তাঁকে। রতনবাবু ঘুরে দেখলেন মাথায় কোঁকড়া চুল সবুজ র‍্যাপার গায়ে দেওয়া একজন লোক—বোধহয় এই হোটেলেরই বাসিন্দা—তাঁর দিকে মুখ করে হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে আছে। রতনবাবুর মুখ দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'সরি—ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে দেখে হঠাৎ মণিলালবাবু বলে মনে হয়েছিল!'

এই প্রশ্নটা শুনে এই প্রথম রতনবাবুর মনে একটা সন্দেহ জাগল—তিনি যে খুনটা করলেন—সেটা সবদিক বিচার করে আটঘাট বেঁধে করেছেন কি? তাঁরা দুজন যে একসঙ্গে বেরিয়েছেন সেটা হয়ত অনেকেই দেখেছে; কিন্তু দেখা মানেই কি লক্ষ করা? যারা দেখেছে তাদের কি কথাটা মনে থাকবে? আর যদি থাকেও, তার মানেই কি সন্দেহটা তাঁর ওপরেই পড়বে? হাট থেকে বেরিয়ে খোলা রাস্তায় পড়বার পর আর তাঁদের কেউ দেখেনি—একথা রতনবাবু খুব ভালোভাবেই জানেন। আর ওভারব্রিজে পৌঁছানোর পর—ও হ্যাঁ সেই সাইকেলওয়ালা তো তাঁদের দুজনকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু তখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওইভাবে দ্রুতবেগে সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় কি সে লোক তাঁদের মুখ চিনে মনে করে রেখে দিয়েছে? অসম্ভব।

রতনবাবু যতই ভাবলেন, ততই তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলেন। মণিলালবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কার হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার ফলে রতনবাবুর উপর সন্দেহ পড়বে, তাঁর বিচার হবে, শাস্তি হবে, তাঁকে খুনী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে—এসব কথা রতনবাবুর কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে রতনবাবু কালিকা হোটেলে বসে এক পেয়ালা চা খেলেন। সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টি থামল। রতনবাবু সটান নিউ মহামায়ায় চলে এলেন। কী অদ্ভুতভাবে ভুল করে তিনি ভুল হোটেলে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেটা ভাবতেও তাঁর হাসি পাচ্ছিল।

রাত্রে পেট ভরে খেয়ে বিছানায় শুয়ে দেশ পত্রিকা খুলে অস্ট্রেলিয়ার বুনো জাতিদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়ে রতনবাবু ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন। আবার তিনি একা এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গী নেই, সঙ্গীর কোনো প্রয়োজনও নেই। তিনি এতকাল যেমনভাবে কাটিয়েছেন, আবার ঠিক তেমনিভাবেই কাটাবেন। এর চেয়ে আরাম আর কী হতে পারে?

বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তার সঙ্গে বিদ্যুতের চমক আর মেঘের

গর্জন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ রতনবাবুর নাক ডাকতে শুরু করেছে।

পরদিন সকালে চা দেবার সময় পঞ্চা বলল, 'ওই লাঠিটা কাল হাটে কিনলেন নাকি বাবু?'

রতনবাবু বলেন, 'হ্যাঁ।'

'কত নিল?'

রতনবাবু দাম বললেন। তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব স্বভাবিক করে বললেন, 'তুমি গিয়েছিলে হাটে?'

পঞ্চা এক গাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ বাবু। দ্যাখলাম তো আপনাকে। আপনি আমায় দেখতে পাননি?'

'কই, না তো!'

এর পরে পঞ্চার সঙ্গে তাঁর আর কোনো কথা হয়নি।

চা খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কালিকা হোটেলের সামনে এসে পৌঁছলেন। কালকের সেই কোঁকড়া চুলওয়ালা ভদ্রলোকটি আরো কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে কথাবার্তা বলছেন। মণিলালবাবুর নাম, আর 'সুইসাইড' কথাটা রতনবাবুর কানে এলো। তিনি ভালো করে শোনার জন্য আরেকটু এগিয়ে গেলেন। শুধু তাই না—একটা প্রশ্নও করে বসলেন।

'কে আত্মহত্যা করল মশাই?'

গতকালের ভদ্রলোক বললেন, 'কাল আপনাকে দেখে যে লোক বলে ভুল করেছিলুম, তিনি।'

'সুইসাইড?'

'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। রেল লাইনের ধারে লাশ পাওয়া গেছে। একটা ওভারব্রিজ আছে, তারই ঠিক নিচে। মনে হয় উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক এমনিতেই একটু অদ্ভুত গোছের ছিলেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। আমরা ওঁকে নিয়ে বলাবলি করতুম।'

'ডেড বডি— ?'

'পুলিশের জিম্মায়। চেঞ্জে এসেছিলেন ভদ্রলোক। চেনাশুনা কেউ নেই এখানে। কলকাতা থেকে এসেছিলেন। এর বেশি আর কিছুই নাকি জানা যায়নি।'

রতনবাবু সহানুভূতির ভঙ্গিতে বার দুয়েক মাথা নেড়ে চুক্ চুক্ করে শব্দ করে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

সুইসাইড ! তাহলে খুনের কথাটা কারুর মাথাতেই আসেনি। কী আশ্চর্য সৌভাগ্য তাঁর। খুন জিনিসটা তো তাহলে ভারী সহজ ! লোকে এত ভয় পায় কেন ?

রতনবাবু মনে মনে ভারী হালকা বোধ করলেন। দুদিন পরে আজ তিনি আবার একা বেড়াতে পারবেন। ভাবতেও আনন্দ লাগে।

গতকাল মণিলালবাবুকে ঠেলা দেবার সময়ই বোধহয় রতনবাবুর সার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। একটা দরজির দোকান খুঁজে বার করে তিনি বোতামটা লাগিয়ে নিলেন। তারপর একটা মনিহারী দোকান থেকে একটা নিম টুথ পেস্ট্ কিনলেন—নাহলে কাল সকালে দাঁত মাজা হবে না। যেটা রয়েছে সেটা টিপে টিপে একেবারে চ্যাপটার শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদূর যেতেই একটা বাড়ির ভিতর থেকে কীর্তনের আওয়াজ এল রতনবাবুর কানে। রতনবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কীর্তন শুনলেন। তারপর শহরের বাইরে একটা নতুন রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক হেঁটে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এসে স্নান খাওয়া সেরে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করলেন।

যথারীতি তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল, আর ভাঙামাত্র রতনবাবু বুঝতে পারলেন যে তাঁর মন চাইছে আজ সন্ধ্যায় আরেকবার ওভারব্রিজটায় যেতে। গতকাল খুব স্বাভাবিক কারণেই রতনবাবু ট্রেনের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারেননি। আকাশে মেঘ অবিশ্যি কাটেনি, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আজ তিনি ট্রেন আসা থেকে শুরু করে চলে যাবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরাম করে দেখবেন।

পাঁচটার সময় চা খেয়ে রতনবাবু নিচে নামলেন। সামনেই ম্যানেজার শম্ভুবাবু বসে আছেন। রতনবাবুকে দেখে বললেন, 'যে ভদ্রলোকটি কাল মারা গেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল নাকি মশাই ?'

রতনবাবু প্রথমটা কিছু না বলে অবাক হবার ভান করে শম্ভুবাবুর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, 'কেন বলুন তো ?'

'না—ইয়ে—মানে, পঞ্চা বলছিল হাটে আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেছে।'

রতনবাবু অল্প হেসে শান্তভাবে বললেন, 'আলাপ আমার এখানে কারুর সঙ্গেই হয়নি। হাটে এক-আধ জনের সঙ্গে কথা হয়েছে বটে, তবে কী জানেন— কোন লোকটি যে মারা গেছেন সেটাই তো আমি জানি না।'

'ও হো !' শম্ভুবাবু হাসলেন। ভদ্রলোক বেশ আমুদে। 'উনিও আপনারই মতো হাওয়া বদলাতে এসেছিলেন। কালিকা হোটেলে উঠেছিলেন।'

'ও, তাই বুঝি !'

রতনবাবু আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় দু মাইল পথ, আর বেশি দেরি করলে ট্রেন দেখা যাবে না।

রাস্তায় তাঁর দিকে আর কেউ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিল না। গতকাল যে ছেলেগুলো জটলা করছিল, তাদের কাউকেই আজ আর দেখা গেল না। ওই 'মানিকজোড়' কথাটা রতনবাবুর ভালো লাগেনি। ছেলেগুলো কোথায় গেল ? একটা ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন রতনবাবু। পাড়ায় পুজো আছে। ছেলেগুলো নির্ঘাত সেখানেই গেছে। রতনবাবু নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চললেন।

খোলা প্রান্তরের মাঝখানের পথে আজ তিনি একা। মণিলালবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার আগেও তিনি নিশ্চিন্ত মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর নিজেকে যেমন হাল্কা মনে হচ্ছে, তেমন হাল্কা এর আগে কখনও মনে হয়নি।

ওই যে বাব্লা গাছ। ওটা পেরিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই ওভারব্রিজ। আকাশ মেঘে ভরা, তবে ঘন কালো মেঘ নয়, ছাইয়েরমতো ফিকে মেঘ। বাতাস নেই, তাই সমস্ত মেঘ যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওভারব্রিজটা দেখতে পেয়ে রতনবাবুর মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন। বলা যায় না—ট্রেন যদি কালকের চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বক উড়ে গেল। ভিনদেশের বক কিনা কে জানে।

ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাটা রতনবাবু বেশ ভালো করে বুঝতে পারলেন। খুব মন দিয়ে কান পাতলে ক্ষীণ ঢাকের শব্দ শহরের দিক থেকে শোনা যায়। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

রতনবাবু রেলিঙের পাশটায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই যে দূরে সিগন্যাল, আর ওই যে আরো দূরে স্টেশন। রেলিং-এর নিচের দিকের কাঠের ফাটলে কী যেন একটা জিনিস চক্‌চক্ করছে। রতনবাবু উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে জিনিসটাকে বার করে আনলেন। সেটা একটা গোল টিনের কৌটো, তার ভিতরে এলাচ আর সুপুরি। রতনবাবু একটু হেসে সেটাকে ব্রিজের উপর থেকে নিচের লাইনে ফেলে দিলেন। ঠুং করে একটা মৃদু শব্দও পেলেন তিনি। কদ্দিন ওইখানে পড়ে থাকবে ওই সুপুরির কৌটো কে জানে।

কিসের আলো ওটা ?

ট্রেন আসছে। এখনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আলো এগিয়ে আসছে।

রতনবাবু অবাক হয়ে আলোটা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসে তাঁর কাঁধ থেকে র‍্যাপারটা খসে পড়ল। রতনবাবু সেটাকে আবার বেশ ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

এবারে শব্দ পাচ্ছেন তিনি। গুড় গুড় গুড় গুম গুম গুম গুম গুম—যেন একটা ঝড় এগিয়ে আসছে, আর সঙ্গে ক্রমাগত একটা মেঘের গর্জন।

রতনবাবুর হঠাৎ মনে হল তাঁর পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময় ট্রেনের দিক থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল—কিন্তু তাও তিনি একবার চারিদিক চট্ করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন। কেউ কোথাও নেই। আজ কালকের চেয়ে অন্ধকার কম, তাই দেখতে অসুবিধে নেই। শুধু তিনি আর ওই দ্রুত ধাবমান জাঁদরেল ট্রেনটা ছাড়া মাইল খানেকের মধ্যে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

ট্রেন এখনো একশো গজের মধ্যে। রতনবাবু রেলিঙের দিকে আরো এগিয়ে গেলেন। আগেকার দিনের স্টিম এঞ্জিন হলে এতটা এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হত না ; চোখে মুখে কয়লার ধোঁয়া ঢুকে যাবার বিপদ ছিল। এ ট্রেন ডীজেল ট্রেন, তাই ধোঁয়া নেই। শুধু বুক কাঁপানো গুরুগম্ভীর শব্দ আর চোখ ঝলসানো হেডলাইটের আলো।

ওই এসে পড়ল ট্রেন ব্রিজটার নিচে।

রতনবাবু তাঁর দু কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে দুটো হাত এসে তাঁর পিঠে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। রতনবাবু টাল সামলাতে পারলেন না, কারণ রেলিংটা ছিল মাত্র দুহাত উঁচু।

মেল ট্রেনটা সশব্দে ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে গেল পশ্চিম দিকে, যেদিকের আকাশে রক্তের রং এখন বেগুনী হয়ে এসেছে।

রতনবাবু এখন আর ব্রিজের উপরে নেই, তবে তাঁর চিহ্নস্বরূপ একটি জিনিস এখনো রেলিং-এর কাঠের একটা ফাটলে আটকে রয়েছে। সেটা সুপুরি আর এলাচে ভরা একটি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো।

ভক্ত

অরূপবাবু—অরূপরতন সরকার—পুরী এসেছেন এগারো বছর পরে। শহরে কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়েছে—কিছু নতুন বাড়ি, নতুন করে বাঁধানো কয়েকটা রাস্তা, দু-চারটে ছোট-বড় নতুন হোটেল—কিন্তু সমুদ্রের ধারটায় এসে বুঝতে পারলেন এ জিনিস বদলাবার নয়। তিনি যেখানে এসে উঠেছেন, সেই সাগরিকা হোটেল থেকে সমুদ্র দেখা না গেলেও, রাত্তিরে বাসিন্দাদের কলরব বন্ধ হয়ে গেলে দিব্যি ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ শুনে কালতো অরূপবাবু বেরিয়েই পড়লেন। কালই তিনি পুরীতে এসেছেন ; দিনে কিছু কেনাকাটার ব্যাপার ছিল তাই আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া হয়নি। রাত্তিরে গিয়ে দেখলেন অমাবস্যার অন্ধকারেও ঢেউয়ের ফেনা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অরূপবাবুর মনে পড়ল ছেলেবেলায় কোথায় জানি পড়েছিলেন যে সমুদ্রের জলে ফসফরাস থাকে, আর সেই কারণেই অন্ধকারেও ঢেউগুলো দেখা যায়। ভারী ভালো লাগল অরূপবাবুর এই আলোমাখা রহস্যময় ঢেউ দেখতে। কলকাতায় তাঁকে দেখলে কেউ ভাবুক বলে মনে করবে না। তা না করুক। অরূপবাবু নিজে জানেন তাঁর মধ্যে এককালে জিনিস ছিল। সে সব যাতে কাজের চাপে একেবারে ভোঁতা না হয়ে যায় তাই তিনি এখনও মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে, ইডেন বাগানে গিয়ে বসে থাকেন, গাছ দেখে জল দেখে ফুল দেখে আনন্দ পান, পাখির গান শুনে চিনতে চেষ্টা করেন সেটা দোয়েল না কোয়েল না পাপিয়া। অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে হল যে ষোলো বছরের চাকুরি জীবনের অনেকখানি অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল।

আজ বিকেলেও অরূপবাবু সমুদ্রের ধারে এসেছেন। খানিকদূর হেঁটে আর হাঁটতে মন চাইছে না, কে এক গেরুয়াধারী সাধুবাবা বা গুরুগোছের লোক হনহনিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার পিছনে একগাদা মেয়ে-পুরুষ

চেলা-চামুণ্ডা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, অরূপবাবুর কাছে এ দৃশ্য পরম উপভোগ্য বলে মনে হচ্ছে, এমন সময় তাঁর বাঁ দিক থেকে কচি গলায় একটি প্রশ্ন হাওয়ায় ভেসে তাঁর কানে এল—

'"খোকনের স্বপ্ন" কি আপনার লেখা ?'

অরূপবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটি সাত-আট বছরের ছেলে, পরনে সাদা সার্ট আর নীল প্যান্ট, হাতের কনুই অবধি বালি। সে ঘাড় উঁচিয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অরূপবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছেলেটি বলল, 'আমি "খোকনের স্বপ্ন" পড়েছি। বাবা জন্মদিনে দিয়েছিল। আমার...আমার...'

'বলো, লজ্জা কী, বলো !'

এবার একটি মহিলার গলা।

ছেলেটি যেন সাহস পেয়ে বলল, 'আমার খুব ভালো লেগেছে বইটা।'

এবার অরূপবাবু মহিলাটির দিকে দৃষ্টি দিলেন। বছর ত্রিশ বয়স, সুশ্রী চেহারা, হাসি হাসি মুখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, আর এক পা দু পা করে এগিয়ে আসছেন।

অরূপবাবু ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'না খোকা, আমি কোনো বইটই লিখিনি। তুমি বোধহয় ভুল করছ।'

ভদ্রমহিলা যে ছেলেটির মা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুজনের চেহারায় স্পষ্ট আদল আছে, বিশেষ করে খাঁজকাটা থুতনিটায়।

অরূপবাবুর কথায় কিন্তু মহিলার মুখের হাসি গেল না। তিনি আরো এগিয়ে এসে আরো বেশি হেসে বললেন, 'আমরা শুনেছি আপনি লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন না। আমার এক দেওর আপনাকে একটা অনুষ্ঠানে সভাপতি হবার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল ; আপনি উত্তরে জানিয়েছিলেন ওসব আপনার একেবারেই পছন্দ না। এবারে কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। আপনার লেখা আমাদের ভীষণ ভালো লাগে। যদিও ছোটদের জন্য লেখেন কিন্তু আমরাও পড়ি।'

"খোকনের স্বপ্ন" বইয়ের লেখক যিনিই হ'ন না কেন, মা ও ছেলে দুজনেই যে তাঁর সমান ভক্ত সেটা বুঝতে অরূপবাবুর অসুবিধা হল না। এমন একটা বেয়াড়া অবস্থায় তাঁকে পড়তে হবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। এদের ধারণা যে ভুল সেটা জানানো দরকার, কিন্তু সরাসরি কাঠখোট্টাভাবে জানালে এরা কষ্ট পাবেন ভেবে অরূপবাবু কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়লেন। আসলে অরূপবাবুর মনটা ভারী নরম। একবার তাঁর ধোপা গঙ্গাচরণ তাঁর একটা নতুন আদ্দির পাঞ্জাবিতে ইস্তিরির দাগ লাগিয়ে সেটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অন্য কেউ হলে গঙ্গাচরণকে দু-এক ঘা কিল চড় খেতে হত নির্ঘাত। অরূপবাবু কিন্তু ধোপার করুণ কাঁচুমাচু ভাব

দেখে শুধু একটিবার মোলায়েমভাবে 'ইস্তিরিটা একটু সাবধানে করবে তো' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর এই দরদী মনের জন্যই আপাতত আর কিছু না বলে বললেন, 'ইয়ে—আমি যে খোকনের স্বপ্নের লেখক সে-বিষয়ে আপনি এতটা শিওর হচ্ছেন কী করে ?'

মহিলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বাঃ—সেদিনই যুগান্তরে ছবি বেরোল না ! বাংলাভাষায় বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে আপনি আকাদেমি পুরস্কার পেলেন, রেডিওতে বলল, আর তার পরদিনই তো কাগজে ছবি বেরোল। এখন শুধু আমরা কেন, অনেকেই অমলেশ মৌলিকের চেহারা জানে।'

অমলেশ মৌলিক ! নামটা শোনা, কিন্তু ছবিটা অরূপবাবু দেখেননি । এতই কি চেহারার মিল ? অবিশ্যি আজকালকার খবরের কাগজের ছাপায় মুখ অত পরিষ্কার বোঝা যায় না ।

'আপনি পুরীতে আসবেন সে খবর রটে গেছে যে,' মহিলা বলে চললেন । 'আমরা সেদিন সী-ভিউ হোটেলে গেলাম । আমার স্বামীর এক বন্ধু কাল পর্যন্ত ওখানে ছিলেন । তাঁকে হোটেলের ম্যানেজার নিজে বলেছেন যে আপনি বিষ্যুদবার আসছেন । আজই তো বিষ্যুদ । আপনি সী-ভিউতে উঠেছেন তো ?'

'অ্যাঁ ? ও—না । আমি, ইয়ে, শুনেছিলাম ওখানের খাওয়াটা নাকি তেমন সুবিধের না ।'

'ঠিকই শুনেছেন । আমরাও তো তাই ভাবছিলাম—এত হোটেল থাকতে আপনার মতো লোক ওখানে উঠছেন কেন । শেষ অবধি কোথায় উঠলেন ?'

'আমি আছি...সাগরিকাতে ।'

'ওহো । ওটা তো নতুন । কেমন হোটেল ?'

'চলে যায় । কয়েকদিনের ব্যাপার তো ।'

'কদিন আছেন ?'

'দিন পাঁচেক ।'

'তাহলে একদিন আমাদের ওখানে আসুন । আমরা আছি পুরী হোটেলে । কত লোক যে আপনাকে দেখবার জন্য বসে আছে । আর বাচ্চাদের তো কথাই নেই । ওকি, আপনার পা যে ভিজে গেল ।'

ঢেউ যে এগিয়ে এসেছে সেদিকে অরূপবাবুর খেয়ালই নেই । শুধু পা ভিজছে বললে ভুল হবে ; এই হাওয়ার মধ্যে অরূপবাবু বুঝতে পারছেন তাঁর সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে । প্রতিবাদ করার সুযোগটা যে কখন কেমন করে ফস্কে গেল সেটা তিনি বুঝতেই পারলেন না । এখন যেটা দরকার সেটা হল এখান থেকে সরে পড়া । কেলেঙ্কারিটা কতদূর গড়িয়েছে সেটা নিরিবিলি বসে ভাবতে না পারলে বোঝা যাবে না ।

'আমি এবার...আসি...'

'নতুন কিছু লিখছেন নিশ্চয় ।'

'নাঃ । এখন, মানে, বিশ্রাম ।'

'আবার দেখা হবে । আমার স্বামীকে বলব । কাল বিকেলে আসছেন তো এদিকে ?'...

সী-ভিউ-এর ম্যানেজার বিবেক রায় সবেমাত্র গালে একটি গুণ্ডিপান পুরেছেন এমন সময় অরূপবাবু তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলেন ।

'অমলেশ মৌলিকমশায়ের কি এখানে আসার কথা আছে ?'

'উঁ'

'এখনো আসেননি ?'

'উহুঁ'

'কবে...আসবেন...সেটা ?'

'মোঙ্গোবা । টেরিগ্গাঁ এয়েহে । ক্যাঁও ?'

মঙ্গলবার । আজ হল বিষ্যুদ । অরূপবাবু আছেন ওই মঙ্গলবার পর্যন্তই । টেলিগ্রাম এসেছে মানে মৌলিকমশাই বোধহয় শেষ মুহূর্তে কোনো কারণে আসার তারিখ পেছিয়েছেন ।

ম্যানেজারকে জিগ্যেস করে অরূপবাবু জানলেন তাঁর অনুমান ঠিকই, আজই সকালে আসার কথা ছিল অমলেশ মৌলিকের ।

বিবেকবাবুর 'ক্যাঁও'-এর উত্তরে অরূপবাবু বললেন যে তাঁর অমলেশবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল । তিনি মঙ্গলবার দুপুরে এসে খোঁজ করবেন ।

সী-ভিউ হোটেল থেকে অরূপবাবু সোজা চলে গেলেন বাজারে । একটি বইয়ের দোকান খুঁজে বার করে অমলেশ মৌলিকের লেখা চারখানা বই কিনে ফেললেন । খোকনের স্বপ্ন পাওয়া গেল না ; কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না । এই চারখানাই যথেষ্ট । দুটো উপন্যাস, দুটো ছোট গল্পের সংকলন ।

নিজের হোটেলে ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে ছ'টা । সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা ঘর, তার বাঁ দিকে ম্যানেজারের বসার জায়গা, ডান দিকে একটা দশ ফুট বাই আট ফুট জায়গায় একটা বেঞ্চি ও দুটো চেয়ার পাতা । চেয়ার দুটিতে দুজন ভদ্রলোক বসা, আর বেঞ্চিতে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে, তাদের কারুরই বয়স দশের বেশি না । ভদ্রলোক দুজন অরূপবাবুকে দেখেই হাসি হাসি মুখ করে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে ঘাড় নাড়তেই তারা সলজ্জ ভাবে অরূপবাবুর দিকে এগিয়ে এসে টিপ্ টিপ্ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল । অরূপবাবু বারণ করতে গিয়েও পারলেন না ।

এদিকে ভদ্রলোক দুটিও এগিয়ে এসেছেন । তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা পুরী হোটেল থেকে আসছি । আমার নাম সুহৃদ সেন, আর ইনি মিস্টার গাঙ্গুলী । মিসেস ঘোষ বললেন আজ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আর আপনি এইখেনে আছেন, তাই ভাবলুম...'

ভাগ্যে বইগুলো ব্রাউন কাগজে বেঁধে দিয়েছিল, নাহলে নিজের বই দোকান থেকে কিনে এনেছে জানতে পারলে এরা না-জানি কী ভাবত ।

অরূপবাবু এদের সব কথাতেই ঘাড় নাড়লেন । প্রতিবাদ যে এখনো করা যায় না তা নয় । এমন আর কী ? শুধু বললেই হল—'দেখুন মশাই, একটা বিশ্রী গণ্ডগোল হয়ে গেছে । আমি নিজে অমলেশ মৌলিকের ছবি দেখিনি, তবে ধরে

নিচ্ছি তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার কিছুটা মিল আছে। হয়ত তাঁরও সরু গোঁফ আছে, তাঁরও কোঁকড়া চুল, তাঁরও চোখে এই আমারই মতো চশমা। এটাও ঠিক যে তাঁরও পুরীতে আসার কথা আছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমি সে-লোক নই। আমি শিশু সাহিত্যিক নই। আমি কোনো সাহিত্যিকই নই। আমি লিখিই না। আমি ইনসিওরেন্সের আপিসে চাকরি করি। নিরিবিলিতে ছুটি ভোগ করতে এসেছি, আপনারা দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আসল অমলেশ মৌলিক মঙ্গলবার সী-ভিউতে আসছেন। আপনারা সেখানে গিয়ে খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

কিন্তু সত্যিই কি এইটুকু বললেই ল্যাঠা চুকে যায়? একবার যখন এদের মগজে ঢুকেছে যে তিনিই অমলেশ মৌলিক, আর প্রথমবারের প্রতিবাদে যখন কোনো কাজ হয়নি, তখন সী-ভিউ-এর ম্যানেজার টেলিগ্রাম দেখালেই কি এদের ভুল ভাঙবে? এরা তো ধরে নেবে যে ওটা হল মৌলিক মশায়ের একটা কারসাজি। আসলে তিনিই ছদ্মনামে এসে রয়েছেন সাগরিকায়, আর আসার আগে সী-ভিউকে একটা ভাঁওতা টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন নিজের নামে, লোকের উৎপাত এড়ানোর জন্য।

প্রতিবাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধার সৃষ্টি করল ওই তিনটি বাচ্চা। তারা তিনজনে হাঁ করে পরম ভক্তিভরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অরূপবাবুর দিকে। প্রতিবাদের নামগন্ধ পেলে এই তিনটি ছেলেমেয়ের আশা আনন্দ উৎসাহ মুহূর্তে উবে যাবে।

'বাবুন, তোমার কী জানবার আছে সেটা জেনে নাও অমলেশবাবুর কাছে!' দুটি ছেলের মধ্যে যেটি বড় তাকে উদ্দেশ করে কথাটা বললেন সুহৃদ সেন।

অরূপবাবু প্রমাদ গুনলেন। আর পালাবার রাস্তা নেই। বাবুন ছেলেটি ঘাড় কাত করে দুহাতের আঙুল পরস্পরের সঙ্গে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করার জন্য তৈরি।

'আচ্ছা, খোকনকে যে বুড়োটা ঘুম পাড়িয়ে দিল সে কি ম্যাজিক জানত?'

চরমসংকটের মধ্যে অরূপবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর মাথায় আশ্চর্যরকম বুদ্ধি খেলছে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাবুনের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় জানত।'

অন্য দুটি বাচ্চাও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ জানত, ম্যাজিক জানত!'

'ঠিক কথা!'—অরূপবাবু এখন সটান সোজা।—'তোমরা যেরকম বুঝবে, সেটাই ঠিক। আমার যা বলার সে তো আমি লিখেই দিয়েছি। বোঝার কাজটা তোমাদের। যেরকম বুঝলে পরে গল্পটা তোমাদের ভালো লাগবে, সেটাই ঠিক।

আর সব ভুল।'

তিন বাচ্চাই অরূপবাবুর কথায় ভীষণ খুশি হয়ে গেল। যাবার সময় সুহৃদ সেন অরূপবাবুকে নেমন্তন্ন করে গেলেন। পুরী হোটেলে এসে রাত্তিরে খাওয়া। আটটি বাঙালী পরিবার সেখানে এসে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে যারা সকলেই অমলেশ মৌলিকের ভক্ত। অরূপবাবু আপত্তি করলেন না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছেন যে অন্তত সাময়িকভাবে তাঁকে অমলেশ মৌলিকের ভূমিকায় অভিনয় করতেই হবে। তার পরিণাম কী হতে পারে সেটা ভাববার সময় এখন নেই। শুধু একটা কথা তিনি বার বার বলে দিলেন সুহৃদবাবুকে—

'দেখুন মশাই, আমি সত্যিই বেশি হৈ চৈ পছন্দ করি না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেসটাই নেই। তাই বলছি কী—আমি যে এখানে রয়েছি সে খবরটা আপনারা দয়া করে আর ছড়াবেন না।'

সুহৃদবাবু কথা দিয়ে গেলেন যে আগামীকাল নেমন্তন্নের পর তাঁরা অরূপবাবুকে আর একেবারেই বিরক্ত করবেন না আর অন্যেও যাতে না করে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে বিছানায় শুয়ে অরূপবাবু অমলেশ মৌলিকের 'হাবুর কেরামতি' বইখানা পড়তে শুরু করলেন। এছাড়া অন্য তিনটে বই হল—টুটুলের অ্যাডভেঞ্চার, কিস্তিমাত ও ফুলঝুরি। শেষের দুটো ছোট গল্প সংকলন।

অরূপবাবু সাহিত্যিক না হলেও, চাকরি জীবনের আগে, বিশেষ করে ইস্কুলে থাকার শেষ তিনটে বছর, দেশী ও বিদেশী অনেক ছোটদের গল্পের বই পড়েছেন। অ্যাদ্দিন পরে ঊনচল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে ছোটদের বই পড়ে তাঁর আশ্চর্য লাগল এই দেখে যে ছেলেবেলায় পড়া অনেক গল্পই তাঁর এখনো মনে আছে, আর সে সব গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে অমলেশ মৌলিকের গল্পের এখানে সেখানে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

বড় বড় হরফে ছাপা একশো সোয়াশো পাতার চারখানা বই শেষ করে অরূপবাবু যখন ঘরের বাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন ততক্ষণে সাগরিকা হোটেল নিঝুম নিস্তব্ধ। সমুদ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত কত হল? বালিশের পাশ থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিলেন অরূপবাবু। তাঁর বাবার ঘড়ি। সেই আদ্যিকালের রেডিয়াম ডায়াল। সমুদ্রের ফেনার মতোই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। বেজেছে পৌনে একটা।

সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পাওয়া শিশুসাহিত্যিক অমলেশ মৌলিক। ভাষা ঝরঝরে, লেখার কায়দা আছে, গল্পগুলো একবার ধরলে শেষ না করে ছাড়া যায়

না। কিন্তু তাও বলতে হয় মৌলিক মশায়ের মৌলিকত্বের অভাব আছে। কত রকম লোক, কত রকম ঘটনা, কত রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তো আমরা হামেশাই শুনি ; আমাদের নিজেদের জীবনেও তো কতরকম ঘটনা ঘটে ; সেই সবের সঙ্গে একটু কল্পনা মিশিয়ে দিলেইতোগল্প হয়ে যায়। তাহলে অন্যের লেখা থেকে এটা ওটা তুলে নেবার দরকার হয় কেন ?

অরূপবাবুর মনে অমলেশ মৌলিক সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাটা জমে উঠেছিল, তার খানিকটা কমে গেল। সেই সঙ্গে তাঁর মনটাও খানিকটা হালকা হয়ে গেল। কাল থেকে তিনি আরেকটু স্বচ্ছন্দে মৌলিকের অভিনয়টা করতে পারবেন।

পুরী হোটেলের পার্টিতে অমলেশ মৌলিকের ভক্তদের ভক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। অরূপবাবু ইতিমধ্যে আরেকটি দোকান থেকে খোকনের স্বপ্ন বইটা জোগাড় করে পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে তেরো জন শিশু ভক্তের তিনশো তেত্রিশ রকম প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মতো করে দিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। পার্টি শেষ হবার আগেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে মধুচাটাবাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করল, কারণ অরূপবাবু তাদের শেখালেন যে মৌ মানে মধু, আর 'লিক্' হল ইংরেজি কথা, যার মানে চাটা। এটা শুনে ডক্টর দাশগুপ্ত মন্তব্য করলেন, 'মধু তো আপনি সৃষ্টি করছেন, আর সেটা চাটছে তো এইসব ছেলেমেয়েরা।' তাতে আবার তাঁর স্ত্রী সুরঙ্গমা দেবী বললেন, 'শুধু ওরা কেন, আমরাও !'

খাওয়া-দাওয়ার পরে দুটো ব্যাপার হল। এক, বাচ্চারা অরূপবাবুকে ধরে বসল তাঁকে অন্তত একটা গল্প বলতেই হবে। তাতে অরূপবাবু বললেন মুখে মুখে বানিয়ে গল্প বলার অভ্যাস তাঁর নেই, তবে তিনি তাঁর নিজের ছেলেবেলার একটা মজার ঘটনা বলবেন। ছেলেবেলায় অরূপবাবুরা থাকতেন বাঞ্ছারাম অক্রূর দত্ত লেনে। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁদের বাড়ি থেকে একদিন একটা দামী ট্যাঁক ঘড়ি চুরি যায়। চোর ধরার জন্য অরূপবাবুর বাবা বাড়িতে এক 'কুলোঝাড়া' ডেকে আনেন। এই কুলোঝাড়া একটা কাঁচিকে চিমটের মতো ব্যবহার করে তাই দিয়ে একটা কুলোকে শূন্যে তুলে ধরে তার উপর মুঠো মুঠো চাল ছুঁড়ে মন্ত্র প'ড়ে বাড়ির নতুন চাকর নটবরকে চোর বলে ধরে দেয়। অরূপবাবুর মেজো কাকা যখন নটবরের চুলের মুঠি ধরে তার পিঠে একটা কিল বসাতে যাবেন, ঠিক সেই সময় ট্যাঁক ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ে একটা বিছানার চাদরের তলা থেকে।

হাততালির মধ্যে গল্প শেষ করে অরূপবাবু বাড়ি যাবেন মনে করে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, যাবেন না যাবেন না !' তারপর তারা দৌড়ে গিয়ে যে যার ঘর থেকে অমলেশ মৌলিকের

লেখা সাতখানা নতুন কেনা বই এনে তাঁর সামনে ধরে বলল, 'আপনার নাম লিখে দিন, নাম লিখে দিন !'

অরূপবাবু বললেন, 'আমি তো ভাই বইয়ে নাম সই করি না !—কক্ষনো করিনি। আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি ; প্রত্যেকটাতে একটা করে ছবি এঁকে দেব। তোমরা পরশু বিকেল সাড়ে চারটের সময় আমার হোটেলে এসে বইগুলো নিয়ে যাবে।'

যাদের বই তারা আবার সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।—'সইয়ের চেয়ে ছবি ঢের ভালো, অনেক ভালো !'

অরূপবাবু ইস্কুলে থাকতে দুবার ড্রইংয়ে প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেই থেকে যদিও আর আঁকেননি, কিন্তু একদিন একটু অভ্যেস করে নিলে কি মোটামুটি যা হোক কিছু এঁকে দেওয়া যাবে না ?

পরদিন শনিবার ভোরবেলা অরূপবাবু তাঁর ডটপেন আর বইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নুলিয়া বস্তির দিকে গিয়ে দেখলেন সেখানে দেখে দেখে আঁকবার অনেক জিনিস আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল। একটা বইয়ে আঁকলেন কাঁকড়ার ছবি, একটাতে আঁকলেন তিনটে ঝিনুক পাশাপাশি বালির উপর পড়ে আছে, একটাতে আঁকলেন দুটো কাক, একটাতে মাছ ধরা নৌকো, একটাতে নুলিয়ার বাড়ি, একটাতে নুলিয়ার বাচ্চা, আর শেষেরটায় আঁকলেন চোঙার মতো টুপি পরা একটা নুলিয়া মাছ ধরার জাল বুনছে।

রবিবার বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটের সময় তাঁর হোটেলে এসে ঝুনি, পিন্টু, চুমকি, শান্তনু, বাবুন, প্রসেনজিৎ আর নবনীতা যে যার বই ফেরত নিয়ে ছবি দেখে ফুর্তিতে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে অরূপবাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে তাঁর মনের খুশি ভাবটা চলে গিয়ে তার জায়গায় একটা দুশ্চিন্তার ভাব বাসা বেঁধেছে। 'আমি অমলেশ মৌলিক'—এ কথাটা যদিও তিনি একটি বারও কারুর সামনে নিজের মুখে উচ্চারণ করেননি, তবুও তিনি বুঝতে পারলেন যে যে-কাজটা তিনি এই তিনদিন ধরে করলেন সেটা একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। পরশু মঙ্গলবার সকালে আসল অমলেশ মৌলিক এসে পৌঁছবেন। অরূপবাবু এ ক'দিনে এই কটি ছেলেমেয়ে এবং তাদের বাপ-মা মাসি-পিসির কাছে যে আদরযত্ন ভক্তি ভালোবাসা পেলেন, তার সবটুকুই আসলে ওই মঙ্গলবার যিনি আসছেন তাঁরই প্রাপ্য। মৌলিক মশায়ের লেখা যেমনই হোক না কেন, এদের কাছে তিনি একজন হিরো। তিনি যখন সশরীরে এসে পৌঁছবেন, এবং সী-ভিউ হোটেলের ম্যানেজার বিবেক রায় যখন সগর্বে সেই খবরটি প্রচার করবেন, তখন যে কী একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা ভাবতেই অরূপবাবুর আত্মারাম

খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

তাঁর পক্ষে কি তাহলে একদিন আগে পালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? না হলে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত্তির অবধি তিনি করবেনটা কী ? গা ঢাকা দেবেন কী করে ? আর সেটা না করতে পারলে এরা তাঁকে ছাড়বে কেন ? ভণ্ড জোচ্চোর বলে তাঁর পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে না ? আর মৌলিক মশাইও জানতে পারলে দু'ঘা না বসিয়ে ছাড়বেন কি ? ষণ্ডা মার্কা সাহিত্যিক কি হয় না ? আর পুলিশ ? পুলিশের ভয়ওতোআছে। এ ধরনের ধাপ্পাতে জেলটেল হয় কি না সেটা অরূপবাবুর জানা নেই, তবে হলে তিনি আশ্চর্য হবেন না। বেশ একটা বড় রকমের অপরাধ যে তিনি করে ফেলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুশ্চিন্তায় ঘুম না হবার ভয়ে অরূপবাবু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরূপবাবু মঙ্গলবার রাত্রের ট্রেনেই যাওয়া স্থির করলেন। আসল অমলেশ মৌলিককে একবার চোখের দেখা দেখবার লোভটা তিনি কিছুতেই সামলাতে পারলেন না। সোমবার সকালে নিজের হোটেলেই খোঁজ করে তিনি গত মাসের যুগান্তরের সেই সংখ্যাটি পেয়ে গেলেন যাতে অমলেশ মৌলিকের ছবি ছিল। সরু গোঁফ, কোঁকড়ানো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা—এ সবই আছে, তবে মিলের মাত্রাটা সঠিক বুঝতে গেলে আসল মানুষটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে, কারণ ছাপা পরিষ্কার নয়। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তা থেকে তাঁকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না। অরূপবাবু স্টেশনে যাবেন। শুধু চাক্ষুষ দেখা নয়, সম্ভব হলে দুটো কথাও বলে নেবেন ভদ্রলোকের সঙ্গে : এই যেমন—'আপনি মিস্টার মৌলিক না ? আপনার ছবি দেখলাম সেদিন কাগজে। আপনার লেখা পড়েছি। বেশ ভালো লাগে'—ইত্যাদি। তারপর তাঁর মালপত্তর স্টেশনে রেখে অরূপবাবু শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। কোনারকটা দেখা হয়নি। মন্দির দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপবেন। গা ঢাকা দেবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই।

মঙ্গলবার পুরী এক্সপ্রেস এসে পৌঁছল বিশ মিনিট লেটে। যাত্রী নামতে শুরু করেছে, অরূপবাবু একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রথম শ্রেণীর দুটো পাশাপাশি বোগীর দিকে লক্ষ রাখছেন। একটি দরজা দিয়ে দুজন হাফপ্যান্ট পরা বিদেশী পুরুষ নামলেন, তারপর একটি স্থূলকায় মারোয়াড়ী। আরেকটি দরজা দিয়ে একটি বৃদ্ধা, তাঁকে হাত ধরে নামাল একটি সাদা প্যান্ট পরা যুবক। যুবকের পিছনে একটি বৃদ্ধ, তার পিছনে—হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, ইনিই অমলেশ মৌলিক। অরূপবাবুর সঙ্গে চেহারার মিল আছে ঠিকই, তবে পাশাপাশি দাঁড়ালে যমজ মনে হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। মৌলিক মশাইয়ের হাইট অরূপবাবুর চেয়ে অন্তত

দু' ইঞ্চি কম, আর গায়ের রং অন্তত দু পোঁচ ময়লা। বয়সও হয়ত সামান্য বেশি, কারণ জুলপিতে দিব্যি পাক ধরেছে, যেটা অরূপবাবুর এখনো হয়নি।

ভদ্রলোক নিজের সুটকেস নিজেই হাতে করে নেমে একটি কুলিকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন। কুলির সঙ্গে সঙ্গে অরূপবাবুও এগিয়ে গেলেন।

'আপনি মিস্টার মৌলিক না ?'

ভদ্রলোক যেন একটু অবাক হয়েই অরূপবাবুর দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কুলি সুটকেসটা মাথায় চাপিয়েছে। এছাড়া মাল রয়েছে অরূপবাবুর কাঁধে একটি ব্যাগ ও একটি ফ্লাস্ক। তিনজনে গেটের দিকে রওনা দিলেন। অরূপবাবু বললেন—

'আমি আপনার বই পড়েছি। কাগজে আপনার পুরস্কারের কথা পড়লাম, আর ছবিও দেখলাম।'

'ও।'

'আপনি সী-ভিউতে উঠছেন ?'

অমলেশ মৌলিক এবার যেন আরো অবাক ও খানিকটা সন্দিগ্ধভাবে অরূপবাবুর দিকে চাইলেন। অরূপবাবু মৌলিকের মনের ভাবটা আন্দাজ করে বললেন, 'সী-ভিউয়ের ম্যানেজার আপনার একজন ভক্ত। তিনিই খবরটা রটিয়েছেন।'

'ও।'

'আপনি আসছেন শুনে এখানকার অনেক ছেলেমেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।'

'উঁ।'

লোকটা এত কম কথা বলে কেন ? তার হাঁটার গতিও যেন কমে আসছে। কী ভাবছেন ভদ্রলোক ?

অমলেশ মৌলিক এবার একদম থেমে গিয়ে অরূপবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'অনেকে জেনে গেছে ?'

'সেইরকমই তো দেখলাম। কেন, আপনার কি তাতে অসুবিধে হল ?'

'না, মানে, আমি আবার একটু একা থাকতে পপ্—পপ্—পপ্—'

'পছন্দ করেন ?'

'হ্যাঁ।'

তোতলা। অরূপবাবুর মনে পড়ে গেল অষ্টম এডওয়ার্ড হঠাৎ সিংহাসন ত্যাগ করার ফলে তাঁর পরের ভাই জর্জ ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তোতলা অথচ তাঁকেই রাজা হতে হবে, আর হলেই বক্তৃতা দিতে হবে।

কুলি মাল নিয়ে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দুজনে আবার হাঁটতে শুরু

করলেন।

'একেই বলে খ্যাখ্-খ্যাতির বি—ইড়ম্বনা।'

অরূপবাবু কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন এই তোতলা সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ করে ঝুনি পিণ্টু চুম্‌কি শান্তনু বাবুন প্রসেনজিৎ আর নবনীতার মুখের অবস্থা কীরকম হবে। কল্পনায় যেটা দেখলেন সেটা তাঁর মোটেই ভালো লাগল না।

'একটা কাজ করবেন ?'—গেটের বাইরে এসে অরূপবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কী ?'

'আপনার ছুটিটা ভক্তদের উৎপাতে মাঠে মারা যাবে এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছে না।'

'আমারও না।'

'আমি বলি কী আপনি সী-ভিউতে যাবেন না।'

'তাৎ-তাহলে ?'

'সী-ভিউয়ের খাওয়া ভাল না। আমি ছিলাম সাগরিকায়। এখন আমার ঘরটা খালি। আপনি সেখানে চলে যান।'

'ও।'

'আর আপনি নিজের নামটা ব্যবহার করবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি গোঁফটা কামিয়ে ফেলতে পারেন।'

'গোঁ-গোঁ— ?'

'এক্ষুনি। ওয়েটিং রুমে চলে যান, দশ মিনিটের মামলা। এটা করলে আপনার নির্ঝঞ্ঝাট ছুটিভোগ কেউ রুখতে পারবে না। আমি বরং কাল কলকাতায় ফিরে আপনার নামে সী-ভিউতে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেব আপনি আসছেন না।'

প্রায় বিশ সেকেণ্ড লাগল অমলেশ মৌলিকের কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে। তারপর তাঁর ঠোঁটের আর চোখের দুপাশে নতুন রেখা দেখা দিল। মৌলিক হাসছেন।

'আপনাকে যে কিক্-কি বলে ধ-ধ-ধ—'

'কিচ্ছু বলতে হবে না। আপনি বরং এই বইগুলোতে একটা করে সই দিন। আসুন এই নিমগাছটার পেছনে—কেউ দেখতে পাবে না।'

গাছের আড়ালে গিয়ে ভক্তের দিকে চেয়ে একটা মোলায়েম হাসি হেসে পকেট থেকে লাল পার্কার কলমটি বার করলেন অমলেশ মৌলিক। প্রাইজ পাবার দিনটি থেকে শুরু করে অনেক কাগজ অনেক কালি খরচ করে তিনি একটি চমৎকার সই বাগিয়েছেন। পাঁচটি বইয়ে পাঁচটি সই। তিনি জানেন যে তাঁর জিভ তোতলালেও কলম তোতলায় না।

অসমঞ্জবাবুর কুকুর

হাসিমারায় বন্ধুর বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে অসমঞ্জবাবুর একটা অনেকদিনের শখ মিটল।

ভবানীপুরের মোহিনীমোহন রোডে দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকেন অসমঞ্জবাবু। লাজপত রায় পোস্টঅফিসের রেজিস্ট্রি বিভাগে কাজ করেন তিনি ; কাজের জায়গা তাঁর বাড়ি থেকে সাত মিনিটের হাঁটা পথ, তাই ট্রাম-বাসের ঝক্কি পোয়াতে হয় না। এমনিতে দিব্যি চলে যায়, কারণ যেসব মানুষ জীবনে কী হল না কী পেল না এই ভেবেই মুখ বেজার করে বসে থাকে, অসমঞ্জবাবু তাদের দলে পড়েন না। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট। মাসে দুটো হিন্দী ছবি, একটা বাঙলা যাত্রা বা থিয়েটার, হপ্তায় দুদিন মাছ আর চার প্যাকেট উইলস সিগারেট হলেই তাঁর চলে যায়। তবে তিনি একা মানুষ, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনও বিশেষ নেই, তাই অনেক সময় মনে হয়েছে একটা কুকুর থাকলে বেশ হত। তাঁর বাড়ির দুটো বাড়ি পশ্চিমে তালুকদারদের যে বিশাল অ্যালসেশিয়ানটা আছে, সে রকম কুকুর না হলেও চলে ; এমনি একটা সাধারণ কুকুর যেটা তাঁকে সকাল সন্ধে সঙ্গ দেবে, তাঁর তক্তপোশের পাশে মেঝেতে গা এলিয়ে পড়ে থাকবে, তিনি আপিস থেকে ফিরলে পরে লেজ নেড়ে আহ্লাদ প্রকাশ করবে, তাঁর আদেশ মেনে তার বুদ্ধি আর আনুগত্যের পরিচয় দেবে। কুকুরকে তিনি ইংরিজিতে আদেশ করবেন এটাও অসমঞ্জবাবুর একটা শখ। 'স্ট্যাণ্ড-আপ' 'সিট ডাউন' 'শেক হ্যাণ্ড', এসব বললে যদি কুকুর মানে তাহলে বেশ হবে। কুকুর জাতটাকে সাহেবের জাত বলে ভাবতে অসমঞ্জবাবুর বেশ ভালো লাগে, আর উনি হবেন সেই সাহেবের মালিক—মানে হিজ মাস্টার আর কী।

মেঘলা দিন, সকাল থেকে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, অসমঞ্জবাবু ছাতা ছাড়াই হাসিমারার বাজারে গিয়েছিলেন কমলালেবু কিনতে। বাজারের এক প্রান্তে একটা

বেঁটে কুলগাছের পাশে বেতের টোকা মাথায় ভুটানী লোকটাকে দেখতে পেলেন তিনি। তিন আঙুলে একটা জ্বলন্ত চুটা ধরে পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে তাঁরই দিকে চেয়ে কেন যে মিটিমিটি হাসছে লোকটা সেটা বুঝতে না পারলেও, কৌতূহলবশে তিনি লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিখিরি কি ? পোশাক দেখে সেটা মনে হওয়া আশ্চর্য নয় ; প্যান্ট আর গায়ের জামাটার অন্তত পাঁচ জায়গায় তাপ্পি লক্ষ করলেন অসমঞ্জবাবু। কিন্তু ভিক্ষের পাত্র বা ঝুলি বলে কিছু নেই ; তার বদলে আছে একটা জুতোর বাক্স, সেই বাক্স থেকে উঁকি মারছে একটা বাদামি রঙের কুকুরছানা।

'গুড মর্নিং!' —চোখ বন্ধ করা হাসি হেসে বলল ভুটানী। উত্তরে অসমঞ্জবাবুও 'গুড মর্নিং' না বলে পারলেন না।

'বাই ডগ ? ডগ বাই ? ভেরি গুড ডগ।'

কুকুরছানাটাকে বাক্স থেকে বার করে মাটিতে রেখেছে ভুটানী। 'ভেরি চীপ। ভেরি গুড। হ্যাপি ডগ।'

কুকুরছানাটা গা ঝাড়া দিল, বোধ হয় পিঠে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার দরুন। তারপর অসমঞ্জবাবুর দিকে চেয়ে তার দেড় ইঞ্চি লম্বা ল্যাজটা বার কয়েক নেড়ে দিল। বেশ কুকুর তো!

অসমঞ্জবাবু এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার সামনে বসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। কুকুরটা দু'পা এগিয়ে এসে তার ছোট জিভটা বার করে, অসমঞ্জবাবুর বুড়ো আঙুলের ডগাটায় একটা মৃদু চাটা দিয়ে দিল। বেশ কুকুর। যাকে বলে ফ্রেণ্ডলি।

'কেতনা দাম ? হাউ মাচ ?'

'টেন রুপীজ।'

সাড়ে সাতে রফা হল। অসমঞ্জবাবু জুতোর বাক্স সমেত কুকুরছানাটাকে নিয়ে বগলদাবা করে বাড়িমুখো হলেন। কমলালেবুর কথাটা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

হাসিমারা স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী বিজয় রাহা তাঁর বন্ধুর এই শখটার কথা জানতেন না। তাই তাঁর হাতে জুতোর বাক্স এবং বাক্সের মধ্যে কুকুরছানা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন বৈকি ; কিন্তু দামটা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'নেড়ী কুত্তাই যদি কেনার ছিল তা সে এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী ভাই ? এ জিনিস তোমার ভবানীপুরে পেতে না ?'

না, ভবানীপুরে পেতেন না। অসমঞ্জবাবু সেটা জানেন। তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তায় অনেক সময় অনেক কুকুরছানা দেখেছেন তিনি। তারা কখনো তাঁকে

দেখে লেজ নাড়েনি বা প্রথম আলাপেই তাঁর বুড়ো আঙুল চেটে দেয়নি। বিজয় যাই বলুক—এ কুকুরের একটা বিশেষত্ব আছে। তবে নেড়ী কুত্তা জেনে অসমঞ্জবাবু খানিকটা আক্ষেপ প্রকাশ করাতে বিজয়বাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে জাত কুকুরের ঝক্কি পোয়ানো অসমঞ্জবাবুর পক্ষে সম্ভব হত না। —'তোর কোনো আইডিয়া আছে একটা জাত কুকুরের কত ঝামেলা ? মাসে মাসে ডাক্তারের খরচায় তোর অর্ধেক মাইনে বেরিয়ে যেত। এ কুকুরকে নিয়ে তোর কোনো চিন্তা নেই। আর এর জন্য কোনো স্পেশাল ডায়েটেরও দরকার নেই। তুই যা খাস তাই খাবে। তবে মাছটা দিসনি, ওটা বেড়ালের খাদ্য। কুকুর মাছের কাঁটা ম্যানেজ করতে পারে না।'

কলকাতায় ফিরে এসে অসমঞ্জবাবুর খেয়াল হল যে কুকুরটার একটা নাম দেওয়া হয়নি। সাহেবী নাম ভাবতে গিয়ে প্রথমে টম ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছিল না, তারপর ছানাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথায় এল যে রঙটা যখন ব্রাউন, তখন ব্রাউনী নামটা হয়ত বেমানান হবে না। ব্রাউনী নামে একটা বিলিতি ক্যামেরা তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ছিল। কাজেই নামটা সাহেবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশ্চর্য নামটা মনে পড়া মাত্র ব্রাউনী বলে ডাকতেই ছানাটা ঘরের কোণে রাখা বেঁটে মোড়াটার উপর থেকে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে তাঁর দিকে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। অসমঞ্জবাবু বললেন, 'সিট ডাউন', আর অমনি ব্রাউনী তার পিছনের পা দুটো ভাঁজ করে থপ্ করে বসে পড়ে তাঁর দিকে চেয়ে একটা ছোট্ট হাই তুলল। অসমঞ্জবাবু এক মুহূর্তের জন্য যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে ব্রাউনী ডগ-শোতে বুদ্ধিমান কুকুর হিসেবে প্রথম পুরস্কার পাচ্ছে।

সুবিধে এই যে চাকর বিপিনেরও কুকুরটাকে পছন্দ হয়ে গেছে, ফলে দিনের বেলায় যে সময়টুকু তিনি বাইরে থাকেন, সে সময়ে ব্রাউনীর দিকে নজর রাখার কাজটা বিপিন খুশি হয়েই করে। অসমঞ্জবাবু তাকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন ব্রাউনীকে আজেবাজে কিছু খেতে না দেয়। —'আর দেখিস রাস্তায়-টাস্তায় না বেরোয়। আজকালকার ড্রাইভারগুলো চোখে ঠুলি দিয়ে গাড়ি চালায়।' অবিশ্যি বিপিনকে ফরমাশ দিয়েও অসমঞ্জবাবুর সোয়াস্তি নেই ; রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে ব্রাউনীর লাঙ্গুলসঞ্চালন না দেখা পর্যন্ত তাঁর উৎকণ্ঠা যায় না।

ঘটনাটা ঘটল হাসিমারা থেকে ফেরার তিনমাস পরে। বারটা ছিল শনি, তারিখ বাইশে নভেম্বর। অসমঞ্জবাবু আপিস থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে সার্টটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে তক্তপোশ ছাড়া তাঁর একমাত্র আসবাব একটা পুরানো কাঠের চেয়ারে বসতেই সেটার একটা পঙ্গু পায়া তাঁর সামান্য ভারও সইতে না

পেরে কাজে ইস্তফা দিল, আর তার ফলে চোখের পলকে অসমঞ্জবাবু চেয়ার সমেত সশব্দে মেঝের সংস্পর্শে এসে গেলেন। এতে তাঁর চোট লাগল ঠিকই, এমন কি চেয়ারের পায়ার মতো তাঁর ডানহাতের কনুইটাও বাতিল হয়ে যাবে কি না সে চিন্তাটাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ তাঁকে তাঁর যন্ত্রণার কথা ভুলিয়ে দিল।

শব্দটা এসেছে তক্তপোশের উপর থেকে। হাসির শব্দ, বোধহয় যাকে বলে খিলখিল হাসি, আর সেটার উৎস হচ্ছে নিঃসন্দেহে তাঁর কুকুর ব্রাউনী, কারণ ব্রাউনীই বসে আছে তক্তপোশের উপর, আর ব্রাউনীরই ঠোঁটের কোণে এখনো লেগে আছে হাসির রেশ।

অসমঞ্জবাবুর সাধারণ জ্ঞানের মাত্রাটা যদি আর সামান্যও বেশি হত তাহলে তিনি জানতেন যে কুকুর কখনও হাসে না। আর এই জ্ঞানের সঙ্গে যদি তাঁর কল্পনাশক্তিও খানিকটা বেশি হত, তাহলে আজকের এই ঘটনা তাঁর নাওয়া-খাওয়া, রাতের ঘুম সব বন্ধ করে দিত। এই দুটোরই অভাবে অসমঞ্জবাবু যেটা করলেন সেটা হল, তিন দিন আগে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটা পুরানো বইয়ের দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে কেনা 'অল অ্যাবাউট ডগ্‌স্' বইটা হাতে নিয়ে বসলেন। তারপর প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে সেটা উল্টেপাল্টে দেখলেন যে তাতে কুকুরের হাসির কোনো উল্লেখ নেই।

অথচ ব্রাউনী যে হেসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু হাসেনি, হাসির কারণে হেসেছে। অসমঞ্জবাবুর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন নরেন ডাক্তার একবার তাঁদের চন্দননগরের বাড়িতে রুগী দেখতে এসে চেয়ার ভেঙে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন, আর তাই দেখে অসমঞ্জবাবু হাসিতে ফেটে পড়ায় বাবার কাছে কানমলা খেয়েছিলেন।

অসমঞ্জবাবু হাতের বইটা বন্ধ করে ব্রাউনীর দিকে চাইলেন। চোখাচোখি হতেই বালিশের উপর সামনের পা দুটো ভর করে দাঁড়িয়ে ব্রাউনী তার তিন মাসে দেড় ইঞ্চি বেড়ে যাওয়া লেজটা নেড়ে দিল। তার মুখে এখন হাসির কোনো চিহ্ন নেই। অকারণে হাসাটা পাগলের লক্ষণ; অসমঞ্জবাবু ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে ব্রাউনী ম্যাড ডগ নয়।

* * *

এর পর সাতদিনের মধ্যে ব্রাউনী আরো দুবার হাসার কারণে হাসল। প্রথমবারের ব্যাপারটা ঘটল রাত্রে। তখন রাত সাড়ে নটা। ব্রাউনীর শোবার জন্য অসমঞ্জবাবু সবে তার তক্তপোশের পাশে মেঝেতে একটা চাদর পেতে দিয়েছেন, এমন সময় ফর ফর শব্দ করে দেওয়ালে একটা আরশোলা উড়ে এসে বসল।

অসমঞ্জবাবু তাঁর এক পাটি চটি নিয়ে সেটাকে তাগ করে মারতে গিয়ে বেমক্কা এক চাপড় মেরে বসলেন দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায়, আর তার ফলে সেটা পেরেক থেকে খসে মাটিতে পড়ে ভেঙে চৌচির। এবারে ব্রাউনীর খিলখিলে হাসি তাঁকে ভাঙা আয়নার জন্য আপসোস করতে দিল না।

দ্বিতীয়বারের হাসিটা অবিশ্যি খিলখিল নয়; সেটা যাকে বলে ফিক্ করে হাসা। অসমঞ্জবাবু এবারে বেশ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন, কারণ ঘটনা বলতে কিছুই ঘটেনি। তবু ব্রাউনী হাসল কেন? উত্তর জোগালো বিপিন। চা এনে ঘরে ঢুকে মনিবের দিকে চেয়ে সেও ফিক্ করে হেসে বলল, 'আপনার কানের পাশে সাবান লেগে রয়েছে বাবু।' আসলে আয়নার অভাবে জানালার আর্শিতে দাড়ি কামিয়েছেন অসমঞ্জবাবু; চাকরের কথায় দু'দিকের জুলফিতেই হাত বুলিয়ে দেখলেন বেশ খানিকটা করে শেভিং সোপ লেগে রয়েছে।

এই সামান্য কারণেও যে ব্রাউনী হেসেছে তাতে অসমঞ্জবাবুর বেশ অবাক লাগল। তিনি দেখলেন যে পোস্টাপিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার ব্রাউনীর কৌতুকভরা দৃষ্টি আর হাসির ফিক্ শব্দটা মনে পড়ছে। অল অ্যাবাউট ডগ্‌স-এ কুকুরের হাসির কথা না থাকলেও, কুকুরের এনসাইক্লোপিডিয়া গোছের একটা বই জোগাড় করতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয় কিছু জানতে পারতেন।

ভবানীপুরের চারটে বইয়ের দোকান, আর তারপর নিউ মার্কেটের সবক'টা বইয়ের দোকান খুঁজেও যখন তিনি ওই জাতীয় কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া পেলেন না, তখন মনে হল—রজনী চাটুজ্যের কাছে গেলে কেমন হয়? তাঁর পাড়াতেই থাকেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রজনী চাটুজ্যে। কী বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন ভদ্রলোক সেটা অসমঞ্জবাবু জানেন না, কিন্তু তাঁর বৈঠকখানাটি যে ভারী ভারী বইয়ে ঠাসা সেটা তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই দেখা যায়।

এক রবিবার সকালে দুগ্‌গা বলে রজনী চাটুজ্যের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন অসমঞ্জবাবু। দূর থেকে ভদ্রলোককে দেখেছেন অনেকবার, কিন্তু তাঁর গলার স্বর যে এত ভারী, আর ভুরু যে এত ঘন সেটা জানা ছিল না। রাগী মানুষ হলেও দরজা থেকে ফিরিয়ে দেননি, তাই খানিকটা ভরসা পেয়ে অসমঞ্জবাবু অধ্যাপকের মুখোমুখি সোফাটায় বসে একবার ছোট্ট করে কেশে গলাটা ঝেড়ে নিলেন। রজনীবাবু হাতের ইংরিজি পত্রিকাটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন।

'আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে আমি এ পাড়াতেই থাকি।'

'অ।...কী ব্যাপার?'

'আপনার বাড়িতে একটা কুকুর দেখেছি, তাই...'

'তাই কী ? আছে তো কুকুর । একটা কেন, দুটো আছে ।'

'ও । আমারও আছে ।'

'আপনারও আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ । একটা ।'

'বুঝলাম । —তা আপনি কি কুকুর-পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে আসছেন ?'

অসমঞ্জবাবু সরল মানুষ, তাই শ্লেষটা ধরতে পারলেন না । বললেন, 'আজ্ঞে না । একটা জিনিসের খোঁজ করতে আপনার কাছে এসেছি ।'

'কী জিনিস ?'

'আপনার কাছে কি কুকুরের এনসাইক্লোপিডিয়া আছে ?'

'না, নেই ।···ও জিনিসটার দরকার হচ্ছে কেন ?'

'না, মানে—আমার কুকুর হাসে । তাই জানতে চাইছিলাম কুকুরের হাসিটা স্বাভাবিক কিনা । আপনার কুকুরও হাসে কি ?'

রজনীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে যতটা সময় লাগল, ততক্ষণ একটানা তিনি অসমঞ্জবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন । তারপর বললেন, 'কখন হাসে আপনার কুকুর ? রাত্তিরে কি ?'

'হ্যাঁ, তা রাত্তিরেও···'

'রাত্তিরে আপনি ক'রকম নেশা করেন ? শুধু গাঁজায় তো হয় না এ জিনিস । তার সঙ্গে ভাঙ, চরস, আফিং—এসবও চলে কি ?'

অসমঞ্জবাবু বিনীতভাবে জানালেন যে একমাত্র ধূমপান ছাড়া তাঁর আর কোনো নেশা নেই, আর সেটাও তিনি কুকুর আসার পর থেকে হপ্তায় চার প্যাকেট থেকে তিন প্যাকেটে নামিয়েছেন, কারণ খরচে কুলোয় না ।

'তাও বলছেন আপনার কুকুর হাসে ?'

'আমি দেখেছি হাসতে । শুনেওছি । আওয়াজ করে হাসে ।'

'শুনুন— ।'

রজনী চাটুজ্যে হাতের পত্রিকাটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসে অসমঞ্জবাবুর দিকে তাকিয়ে একেবারে ষোলো আনা অধ্যাপকের মেজাজে বলেন, 'আপনার একটি তথ্য বোধহয় জানা নেই ; সেটা জেনে রাখুন । ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে জগতে, তার মধ্যে মানুষ ছাড়া আর কেউ হাসে না, হাসতে জানে না, হাসতে পারে না । এটাই হচ্ছে মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য । কেন এমন হল সেটা জিগ্যেস করবেন না, কারণ সেটা জানি না । শুনেছি ডলফিন নামে শুশুক জাতীয় একরকম প্রাণীর নাকি রসবোধ আছে, তারা হাসলেও হাসতে পারে, কিন্তু এছাড়া আর কোনো প্রাণী হাসে না । মানুষ যে কেন হাসে সেটার কোনো স্পষ্ট কারণ জানা নেই । বাঘা বাঘা দার্শনিকরা অনেক ভেবে এর কারণ নির্দেশ

করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মতের মিল হয়নি । —বুঝেছেন ?'

অসমঞ্জবাবু বুঝলেন, আর এও বুঝলেন যে এবার তাঁকে উঠতে হবে, কারণ রজনী চাটুজ্যের দৃষ্টি কথা শেষ করেই চলে গেছে তাঁর হাতের পত্রিকার দিকে ।

ডাঃ সুখময় ভৌমিক—যাঁকে কেউ কেউ ভৌ-ডাক্তার বলেন—কলকাতার একজন নামকরা কুকুরের ডাক্তার । সাধারণ লোকে তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও একজন কুকুরের ডাক্তার সেটা করবে না এই বিশ্বাসে অসমঞ্জবাবু খোঁজ খবর নিয়ে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গোখেল রোডে ভৌমিকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন । গত চার মাসে সতেরো বার হেসেছে ব্রাউনী । এটা অসমঞ্জবাবু লক্ষ করেছেন যে মজার কথা শুনলে ব্রাউনী হাসে না, কেবল মজার ঘটনা দেখলেই হাসে । যেমন বোম্বাগড়ের রাজা শুনে ব্রাউনীর মুখে কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু আধসেদ্ধ আলুর দমের আলু যখন অসমঞ্জবাবুর আঙুলের চাপে পিছলে ছিটকে দইয়ের মধ্যে পড়ল, আর সেই দইয়ের ছিটে যখন অসমঞ্জবাবুর নাকের ডগায় লাগল, তখন ব্রাউনীর প্রায় বিষম লাগার জোগাড় । রজনী চাটুজ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী-টানী বলে তো তাঁকে বিস্তর জ্ঞান দিলেন, কিন্তু অসমঞ্জবাবুর চোখের সামনে যে অধ্যাপকের কথা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে ?

এই সব ভেবে-টেবে বিশ টাকা ফী জেনেও অসমঞ্জবাবু গেলেন ভৌ-ডাক্তারের কাছে । কুকুরের হাসির কথা শোনার আগেই তার চেহারা দেখে ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল ।

'অনেক মংগ্রেল দেখিচি মশাই, কিন্তু এমনটি তো দেখিনি ।'

ডাক্তার দুহাতে ব্রাউনীকে তুলে তাঁর টেবিলের উপর দাঁড় করালেন । ব্রাউনী তার পায়ের সামনের পিতলের পেপারওয়েটটাকে একবার শুঁকে নিল ।

'কী খাওয়াচ্ছেন একে ?'

'আজ্ঞে আমি যা খাই তাই খায় । জাত কুকুর তো নয়, কাজেই অতটা···'

ভৌমিক ভুরু কুঁচকোলেন । ভারী মনোযোগ আর কৌতূহলের সঙ্গে দেখছেন তিনি ব্রাউনীকে ।

'জাত কুকুর দেখলে অবিশ্যি আমরা বুঝি', বললেন ভৌমিক, 'তবে সারা বিশ্বের সব জাত কুকুর যে আমাদের চেনা সেকথা জোর দিয়ে বলি কী করে বলুন । এটার চেহারা দেখে ফস করে দোআঁশলা বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে । আপনি একে ডাল ভাত খাওয়াবেন না, আমি একটা খাবারের তালিকা করে দিচ্ছি ।'

অসমঞ্জবাবু এবার আসল কথায় যাবার একটা চেষ্টা দিলেন ।

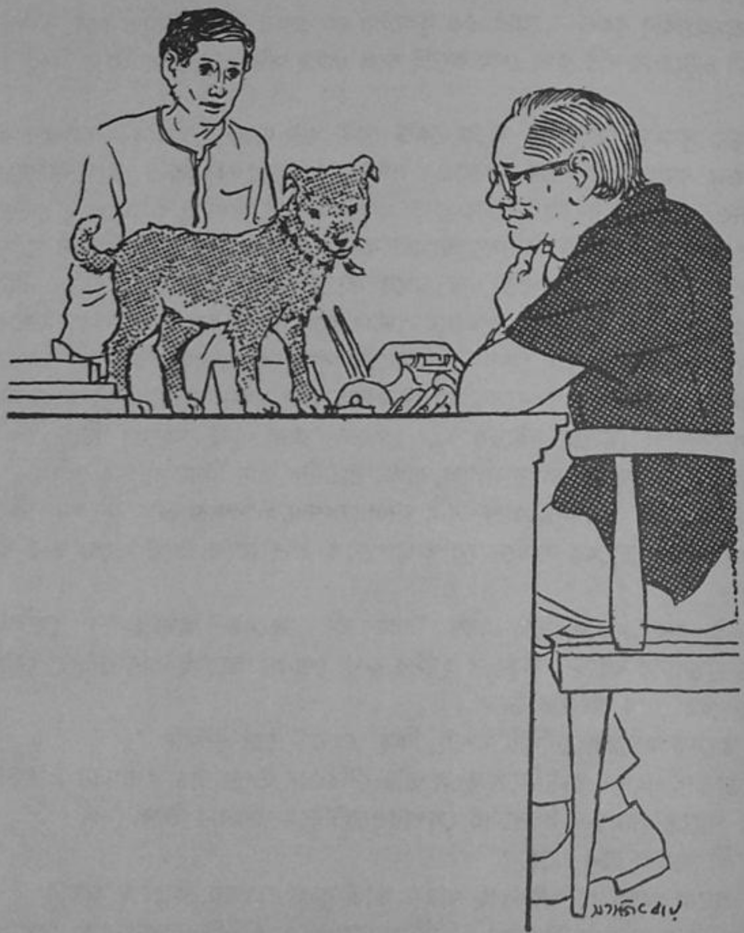

'ইয়ে, আমার কুকুরের একটা বিশেষত্ব আছে, যার জন্য আপনার কাছে আসা।'

'কী বলুন তো ?'

'কুকুরটা হাসে।'

'হাসে ?'

'হ্যাঁ—মানে, মানুষের মতো করে হাসে।'

'বলেন কী ! কই দেখি হাসান তো দেখি।'

এইখানেই মুশকিলে পড়ে গেলেন অসমঞ্জবাবু। এমনিতেই তিনি বেশ লাজুক মানুষ, কাজেই সার্কাসের ক্লাউনের মতো হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করে তিনি ব্রাউনীকে হাসাবেন এমন ক্ষমতা তাঁর নেই। আর ঠিক এই মুহূর্তে এই ডাক্তারের ঘরে কোনো হাস্যকর ঘটনা ঘটবে এটাও আশা করা যায় না। তাঁকে তাই বাধ্য হয়ে বলতে হল অত সহজে ফরমাইশি হাসি হাসে না তাঁর কুকুর, কেবল কোনো হাসির ঘটনা দেখলেই হাসে।

এর পরে ডাঃ ভৌমিক আর বেশি সময় দিলেন না অসমঞ্জবাবুকে। বললেন, 'আপনার কুকুরের চেহারাতেই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে ; তার সঙ্গে আবার হাসিটাসি জুড়ে দিয়ে আরো বেশি অসাধারণ করে তুলবেন না। তেইশ বছর কুকুরের ডাক্তারির অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আপনাকে—কুকুর কাঁদে, কুকুর ভয় পায়, কুকুর রাগ ঘৃণা বিরক্তি হিংসে এ সবই প্রকাশ করে, এমনকি কুকুর স্বপ্নও দেখে ; কিন্তু কুকুর হাসে না।'

এই ঘটনার পর অসমঞ্জবাবু ঠিক করলেন যে আর কোনোদিন কাউকে কুকুরের হাসির কথা বলবেন না। প্রমাণ দেবার উপায় যখন নেই, তখন বলে কেবল নিজেই অপ্রস্তুত হওয়া। কেউ নাই বা জানুক, তিনি তো জানেন। ব্রাউনী তাঁর কুকুর, তাঁরই সম্পত্তি। তাঁদের দুজনের এই জগতে বাইরের লোককে টেনে আনার কী দরকার ?

কিন্তু মানুষে যা ভাবে সব সময় তো তা হয় না। ব্রাউনীর হাসিও একদিন বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন থেকেই অসমঞ্জবাবু অভ্যাস করে নিয়েছিলেন কাজ থেকে ফিরে এসে ব্রাউনীকে নিয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকটায় একটা চক্কর মেরে আসা। একদিন এপ্রিল মাসের একটা বিকেলে বেড়ানোর সময় হঠাৎ আচমকা এল তুমুল ঝড়। আকাশের দিকে চেয়ে অসমঞ্জবাবু বুঝলেন এখন বাড়ি ফেরা মুশকিল, কারণ বৃষ্টিরও আর বেশি দেরি নেই। তিনি ব্রাউনীকে নিয়ে মেমোরিয়ালের দক্ষিণ দিকে কালো ঘোড়সওয়ার মাথায় করা শ্বেতপাথরের তোরণটার নিচে আশ্রয় নিলেন।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে, চারদিকে লোকজন পরিত্রাহি ছুটছে ছাউনী লক্ষ করে, এমন সময় সাদা প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরা একটি মাঝবয়সী ফরসা মোটা বেঁটে ভদ্রলোক তাঁদের থেকে হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে তার হাতের ছাতাটা খুলে মাথায় দিতেই ঝড়ের দাপটে সেটা হড়াৎ শব্দ করে উলটে গিয়ে অকেজো হয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, এই দৃশ্য দেখে অসমঞ্জবাবুরই হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি হাসার আগেই ব্রাউনীর অট্টহাস্য

ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে পৌঁছে গেল সেই অপ্রস্তুত ভদ্রলোকের কানে। ভদ্রলোক ছাতাটা আবার সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টা বন্ধ করে অবাক বিস্ময়ে ব্রাউনীর দিকে চাইলেন। এদিকে ব্রাউনীর এখন কুটিপাটি অবস্থা, অসমঞ্জবাবু তার মুখের উপর হাত চেপে হাসি থামানোর চেষ্টায় বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

হতভম্ব ভদ্রলোক ভূত দেখার ভাব করে এগিয়ে এলেন অসমঞ্জবাবুর দিকে। ব্রাউনীর হাসির তেজ খানিকটা কমেছে, কিন্তু তাও একজন লোকের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

'লাফিং ডগ।'

ভদ্রলোকের মুখে রা নেই দেখে অসমঞ্জবাবুই বললেন কথাটা।

'লা-ফিং ড-গ!' বহুদূরের পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনির মতো ফিরে এল কথাটা ভদ্রলোকের মুখ থেকে। 'হাউ এক্সট্রার্ডিনারি!'

অসমঞ্জবাবু দেখেই বুঝেছিলেন যে ভদ্রলোক বাঙালী নন; হয়ত গুজরাটি বা পারসী হবে। কোনো প্রশ্ন যদি করেন ভদ্রলোক তাহলে ইংরিজিতে করবেন, আর অসমঞ্জবাবুকেও জবাব দিতে হবে ইংরিজিতেই।

বৃষ্টিটা বেড়েছে। ভদ্রলোক অসমঞ্জবাবুর পাশেই আশ্রয় নিলেন ঘোড়সওয়ারের নিচে, এবং যে দশ মিনিট ধরে বৃষ্টিটা চলল তার মধ্যে ব্রাউনী সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সব জেনে নিলেন। সেই সঙ্গে অসমঞ্জবাবুর নিজের ঠিকানাটাও দিতে হল। ভদ্রলোক বললেন তাঁর নাম পিলু পোচকানওয়ালা। তিনি কুকুর সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তাঁর একটা ড্যালমেশিয়ান নাকি দুবার ডগ-শোতে প্রাইজ পেয়েছে, এমনকি তিনি কুকুর সম্বন্ধে কাগজে লিখেটিখেও থাকেন। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবনে আজকের মতো তাক-লাগানো ঘটনা আর ঘটেনি, ভবিষ্যতে আর ঘটবে না। তিনি মনে করেন এ বিষয়ে একটা কিছু করা দরকার, কারণ অসমঞ্জবাবু নিজে নাকি বুঝতে পারছেন না তিনি কী আশ্চর্য সম্পদের অধিকারী।

বৃষ্টি থামার পরে চৌরঙ্গীর এডওয়ার্ড কোর্টে তাঁর বাসস্থানে ফেরার পথে পোচকানওয়ালা যে মিনিবাসের ধাক্কা খেয়ে কোমর ভাঙলেন, তার জন্য ব্রাউনীকে খানিকটা দায়ী করা চলে, কারণ লাফিং ডগের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকার ফলে ভদ্রলোক রাস্তা পেরোবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেননি। আড়াই মাস হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে পোচকানওয়ালা হাওয়া বদলের জন্য যান নৈনিতাল। সেখানে একমাস থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সেইদিনই সন্ধ্যায় বেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ বালাপুরিয়া ও মিঃ বিসোয়াসকে লাফিং ডগের ঘটনাটা বললেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাটা পৌঁছে গেল ক্লাবের সাতাশজন সদস্য ও তিনটি বেয়ারার কানে, এবং পরদিন দুপুরের মধ্যে এই

ত্রিশজন মারফত ঘটনাটা জেনে গেল কমপক্ষে হাজার কলকাতাবাসী।

এই সাড়ে তিন মাসে ব্রাউনী আর হাসেনি। তার একটা কারণ হয়ত এই যে, হাসির ঘটনা কোনো ঘটেনি। তাতে অবিশ্যি অসমঞ্জবাবু কোনো উদ্বেগ বোধ করেননি। কুকুরের হাসি ভাঙিয়ে খাবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর কোনোদিন ছিল না। এই সাড়ে তিন মাসে তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছেন যে ব্রাউনী এসে তাঁর নিঃসঙ্গতা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছে। সত্যি বলতে কী, কোনো মানুষের প্রতি অসমঞ্জবাবু কোনোদিন এতটা মমতা বোধ করেননি।

পোচকানওয়ালার দৌলতে যাঁরা লাফিং ডগের খবরটা পেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি সেই কাগজের এক সাংবাদিক রজত চৌধুরীকে ডেকে অসমঞ্জবাবুর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করলেন। অসমঞ্জবাবু যে লাজপত রায় পোস্টাপিসের কেরানি সে খবরটা পোচকানওয়ালার জবানীতেই রটে গিয়েছিল।

অসমঞ্জবাবু অবিশ্যি তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের আগমনের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর বিস্ময় খানিকটা কাটল যখন রজত চৌধুরী পোচকানওয়ালার উল্লেখ করলেন। অসমঞ্জবাবু ভদ্রলোককে ঘরে এনে নতুন পায়া-লাগানো চেয়ারটায় বসিয়ে নিজে খাটে বসলেন। সেই সাতান্ন সালে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ-এর পর এই তাঁর প্রথম ইন্টারভিউ। ব্রাউনী ঘরের এক কোণে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে একটা পিঁপড়ের সারির গতিবিধি লক্ষ করছিল, তার মনিবকে খাটে বসতে দেখে সে এক লাফে তাঁর পাশে গিয়ে হাজির হল।

রজত চৌধুরীকে টেপ রেকর্ডারের চাবি টিপতে দেখে অসমঞ্জবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল সাংবাদিককে একটা কথা জানানো দরকার। তিনি বললেন, 'ইয়ে, আমার কুকুর আগে হাসত ঠিকই, কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েকমাস আর হাসেনি; কাজেই আপনি ওর হাসি চাক্ষুষ দেখতে চাইলে আপনাকে হতাশ হতে হবে।'

আজকালকার অনেক তরুণ সাংবাদিকদের মতোই রজত চৌধুরী একটা বেশ চনমনে দাঁওমারা ভাব বোধ করছিলেন এই সাক্ষাৎকারের শুরুতে। কথাটা শুনে তিনি খানিকটা হতাশ হলেও মনের ভাবটা যথাসম্ভব আড়াল করে বললেন, 'ঠিক আছে। তবু কতকগুলো ডিটেলস্ আমি জেনে নিই। যেমন প্রথম হচ্ছে, আপনার কুকুরের নাম কী?'

এগোনো মাইকটার দিকে গলা বাড়িয়ে অসমঞ্জবাবু বললেন, 'ব্রাউনী।'

'ব্রাউনী…'। এটা রজত চৌধুরীর দৃষ্টি এড়াল না যে নামটা উচ্চারণ হতেই কুকুরের লেজটা দুলে উঠেছে।

'ওর বয়স কত?' দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন রজত চৌধুরী।

'এক বছর এক মাস।'

'আচ্ছা—আপনি এটাকে পে-প্লে-প্লেলেন কোথায়?'

এটা আগেও হয়েছে। অনেক হোমরা-চোমরার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে রজত চৌধুরীর জিভের এই দোষটি তাকে আচমকা অপ্রস্তুত করে ফেলেছে। এখানেও তাই হতে পারত, কিন্তু ফল হল উল্টো। এই তোতলামো ব্রাউনীর বৈশিষ্ট্যপ্রকাশে আশ্চর্যভাবে সাহায্য করল। পোচকানওয়ালার পরে রজত চৌধুরী হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নিজের কানে শুনলেন কুকুরের মুখে মানুষের হাসি।

পরের রবিবার সকালে গ্র্যাণ্ড হোটেলের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত দু'শো সাতষট্টি নম্বর কামরায় বসে আমেরিকার সিনসিনাটি শহরের অধিবাসী উইলিয়াম পি. মূডি কফি খেতে খেতে স্টেটসম্যান পত্রিকায় লাফিং ডগ-এর বিবরণ পড়ে হোটেলের অপারেটরকে ফোন করে বললেন টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের মিস্টার ন্যানডির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। এই ন্যানডি ছোকরাটি যে কলকাতার রাস্তাঘাট ভালোই চেনে তার প্রমাণ মূডি সাহেব গত দুদিনে পেয়েছেন। স্টেটসম্যানে লাফিং ডগ-এর মালিকের নাম ঠিকানা বেরিয়েছে। মূডি সাহেবের তাঁর সঙ্গে দেখা করা একান্ত দরকার।

অসমঞ্জবাবু স্টেটসম্যান পড়েন না। তাছাড়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি যে কবে বেরোবে সেটা রজত চৌধুরী বলে যাননি; দিনটা জানা থাকলে হয়ত তিনি কাগজের খোঁজ করতেন। তাঁকে খবরটা বলল জগুবাবুর বাজারে তাঁর পাড়ার জয়দেব দত্ত।

'আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক', বললেন জয়দেববাবু, 'এমন একটা তাজ্জব জিনিস ঘরে নিয়ে বসে আছেন এক বচ্ছর যাবৎ, আর কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানাননি! আজ বেলা করে যাব একবারটি আপনার ওখানে। দেখে আসব আপনার কুকুর।'

অসমঞ্জবাবু প্রমাদ গুনলেন। উৎপাতের সমূহ সম্ভাবনা। সত্যি বলতে কী, আপিসের বাইরে মানুষের সঙ্গ তাঁর মোটেই ভালো লাগে না। কোনোদিনই লাগত না—ব্রাউনী আসার পরে তো নয়ই। অথচ কলকাতার লোকেরা যা হুজুগে; এমন একটা খবর পড়ে কি আর তারা এই আশ্চর্য কুকুরটি দেখার লোভ সামলাতে পারবে?

অসমঞ্জবাবু দ্বিধা না করে বাড়ি ফিরে দশ মিনিটের মধ্যে ব্রাউনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনে প্রথম একটি ট্যাক্সি ডেকে তাতে চেপে সোজা চলে গেলেন বালীগঞ্জ রেলের স্টেশনে। সেখান থেকে চাপলেন ক্যানিং-এর ট্রেনে। পথে তালিত বলে একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে পর জায়গাটাকে বেশ নিরিবিলি মনে হওয়ায় ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। সারা দুপুর বাঁশবন

আমবনের ছায়া-শীতল পরিবেশে ঘুরে ভারী আরাম বোধ হল। ব্রাউনীকে দেখে মনে হল তারও ভালো লাগছে। তার ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা আজ দেখলেন অসমঞ্জবাবু, সেটা একেবারে নতুন হাসি। এটা হল প্রসন্নতার হাসি, আরামের হাসি, মেজাজখুশ হাসি। অল অ্যাবাউট ডগস্ বইতে অসমঞ্জবাবু পড়েছিলেন যে কুকুরের এক বছর নাকি মানুষের সাত বছরের সামিল। কিন্তু এক বছরের ব্রাউনীর হাবভাব দেখে তাঁর মনে হচ্ছে এই কুকুরটির মনের বয়স সাতের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি।

বাড়ি ফিরতে হল প্রায় সাতটা। বিপিন দরজা খুলতে অসমঞ্জবাবু জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁরে কেউ এসেছিল?' বিপিন জানাল সারাদিনে অন্তত চল্লিশবার তাকে কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতে হয়েছে। অসমঞ্জবাবু মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করলেন।

বিপিনকে চা করতে বলে গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রাখতেই কড়া নাড়ার শব্দ হল। 'ধুত্তেরি' বলে দরজা খুলে সামনে সাহেব দেখেই অসমঞ্জবাবু বলে ফেললেন, 'রং নাম্বার।' তারপর সাহেবের পাশে চশমা পরা এক বাঙালী যুবককে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'কাকে চাই?'

'বোধহয় আপনাকে,' বললেন টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের শ্যামল নন্দী। 'আপনার পিছনে যে কুকুরটাকে দেখছি সেটার সঙ্গে আজকের কাগজের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। ভেতরে আসতে পারি?'

অসমঞ্জবাবু অগত্যা দুজনকে তাঁর ঘরে এনে বসালেন। সাহেব বসলেন চেয়ারে, নন্দী মোড়াতে আর অসমঞ্জবাবু নিজে বসলেন খাটে। ব্রাউনীর যেন কেমন একটা ইতস্তত ভাব; সে ঘরে না ঢুকে চৌকাঠের ঠিক বাইরে রয়ে গেল। তার কারণ বোধহয় এই যে, এর আগে সে এই ঘরে কখনো একসঙ্গে তিনজন পুরুষকে দেখেনি।

'ব্রাউনী! ব্রাউনী! ব্রাউনী! ব্রাউনী!'

ঘাড় নিচু, চোখ সঙ্কুচিত এবং ঠোঁট ছুঁচলো করে সাহেব হাসি হাসি মুখে ব্রাউনীর দিকে চেয়ে মিহি গলায় তার নাম ধরে ডাকছে। ব্রাউনীও একদৃষ্টে সাহেবকে পর্যবেক্ষণ করছে।

স্বভাবতই অসমঞ্জবাবুর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—এঁরা কারা? সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্যামল নন্দী। সাহেব মার্কিন মুলুকের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, ভারতবর্ষে এসেছেন পুরানো রোলস রয়েস গাড়ির সন্ধানে। সকালে ব্রাউনীর বিষয়ে খবরের কাগজে পড়ে তাকে একবার দেখার লোভ সামলাতে পারেননি। সাহেব ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারবেন না বলে শ্যামল নন্দী তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

অসমঞ্জবাবু লক্ষ করলেন সাহেব এবার নাম ধরে ডাকা ছেড়ে চেয়ার থেকে নেমে এসে নানারকম মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ কুকুরকে হাসানোর চেষ্টা চলেছে।

মিনিট তিনেক এইভাবে সঙবাজি চালাবার পর সাহেব হাল ছেড়ে অসমঞ্জবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'ইজ হি সিক্ ?'

অসমঞ্জবাবু জানালেন তাঁর কুকুরের কোনো ব্যারাম হয়েছে বলে তিনি জানেন না।

'ডাঁজ হি রিয়েলি ল্যাঁফ ?'

মার্কিনি ইংরিজি পাছে অসমঞ্জবাবু না বোঝেন তাই শ্যামল নন্দী অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলেন সাহেব জানতে চাইছেন কুকুরটা সত্যিই হাসে কিনা।

অসমঞ্জবাবুর অন্তরের ভিতর থেকে একটা বিরক্তির ভাব বাইরে ঠেলে বেরোতে চেষ্টা করছিল। সেটাকে মনের জোরে দাবিয়ে রেখে বললেন, 'সব সময় হাসে না। যেমন সব মানুষও হাসতে বললেই হাসে না।'

এবার দোভাষীর অনুবাদ শুনে সাহেবের মুখে লালের ছোপ পড়ল। তারপর তিনি জানালেন যে প্রমাণ না পেলে তিনি কুকুরের পিছনে খরচ করতে রাজী নন, কারণ দেশে ফিরে অপ্রস্তুতে পড়তে চান না তিনি। তিনি আরো জানালেন তাঁর বাড়িতে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে চীন থেকে পেরু পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোনো দেশ

নেই যেখানকার কোনো না কোনো আশ্চর্য জিনিস নেই। একটি প্যারট আছে তাঁর কাছে, যেটা ল্যাটিন ভাষা ছাড়া কথা বলে না। —'এই লাফিং ডগটি কেনার জন্য আমি সঙ্গে চেক বই নিয়ে এসেছিলাম।'

কথাটা বলে সাহেব তাঁর বুক পকেট থেকে সড়াত করে একটি নীল বই বার করে দেখালেন। অসমঞ্জবাবু আড় চোখে দেখলেন তার মলাটে লেখা সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক।

'আপনার ভোল পালটে যেত মশাই', বললেন শ্যামল নন্দী, 'আপনার কুকুরকে হাসাবার যদি কোনো উপায় জানা থাকে তাহলে সেইটি এবার ছাড়ুন। ইনি বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজী আছেন ওই কুকুরের জন্য। মানে টাকার হিসেব দেড় লাখ।'

বাইবেলে লিখেছে ঈশ্বর সাতদিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ কিন্তু কল্পনার সাহায্যে সাত সেকেণ্ডেই এ কাজটা করতে পারে। শ্যামল নন্দীর কথা শোনামাত্র অসমঞ্জবাবু যে জগৎটা চোখের সামনে দেখতে পেলেন, সেখানে তিনি একটি পেল্লায় ছিমছাম ঘরে বার্ড কোম্পানীর বড় সাহেবের মতো পায়ের উপর পা তুলে আরাম কেদারায় বসে আছেন, আর বাইরের বাগান থেকে ভেসে আসছে হাসনাহানা ফুলের গন্ধ। দুঃখের বিষয় তাঁর এই ছবি বুদ্বুদের মতো ফুডুত হয়ে গেল একটা শব্দে।

ব্রাউনী হাসছে।

এ হাসি আগের কোনো হাসির মতো নয় ; এ একেবারে নতুন হাসি।

'বাঁট হি ইজ ল্যাফিং !'

মূডি সাহেব কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়েছেন, আর দুই চোখ দিয়ে গিলছেন এই দৃশ্য। জানোয়ার হলে তাঁর কানটাও যে খাড়া হয়ে উঠত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই অসমঞ্জবাবুর।

এবার কম্পিত হস্তে মূডি সাহেব তাঁর পকেট থেকে আবার বার করলেন তাঁর চেক বই। আর সেই সঙ্গে একটি সোনার পার্কার কলম।

ব্রাউনী কিন্তু হেসে চলেছে। অসমঞ্জবাবুর মনে খটকা, কারণ তিনি এ হাসির মানে বুঝতে পারছেন না। কেউ তোতলায়নি, কেউ হোঁচট খায়নি, কারুর ছাতা উল্টে যায়নি, চটির আঘাতে কোনো আয়না দেয়াল থেকে খসে পড়েনি—তাহলে কেন হাসছে ব্রাউনী ?

'আপনার কপাল ভালো', বললেন শ্যামল নন্দী। 'তবে আমার কিন্তু একটা কমিশন পাওয়া উচিত, কী বলেন—হেঃ হেঃ।'

মূডি সাহেব মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসে চেক বই খুললেন। 'অ্যাঁস্ক হিম হাঁউ হি স্পেঁল্‌স হিজ নেম।'

'সাহেব আপনার নামের বানান জিগ্যেস করছেন,' বললেন, দোভাষী শ্যামল নন্দী।

অসমঞ্জবাবু কথাটার উত্তর দিলেন না, কারণ তিনি হঠাৎ আলো দেখতে পেয়েছেন। আর সেই আলো তাঁর মনে গভীর বিস্ময় জাগিয়েছে। নামের বানানের বদলে তিনি বললেন, 'সাহেবকে বলুন কুকুর কেন হাসছে সেটা জানলে তিনি আর টাকার কথা তুলতেন না।'

'আপনি আমাকেই বলুন না,' শুকনো গলায় কড়া সুরে বললেন শ্যামল নন্দী। ঘটনার গতি তাঁর মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না। মিশন ফেল করলে সাহেবের ধাতানি আছে তাঁর কপালে এটা তিনি জানেন।

ব্রাউনীর হাসি থেমেছে। অসমঞ্জবাবু তাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন, 'সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে।'

'বটে ? আপনার কুকুর বুঝি দার্শনিক ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তার মানে আপনি কুকুর বেচবেন না ?'

'আজ্ঞে না।'

শ্যামল নন্দী অবিশ্যি তাঁর অনুবাদে কুকুরের মনের ভাবের কথা কিছুই বললেন না, শুধু জানিয়ে দিলেন যে কুকুরের মালিক কুকুর বেচবেন না। কথাটা শুনে কলম, চেক-বই পকেটে পুরে প্যান্টের হাঁটু থেকে অসমঞ্জবাবুর মেঝের ধুলো হাত দিয়ে ঝেড়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় সাহেব শুধু মাথা নেড়ে বলে গেলেন, 'হি মাস্ট বি ক্রেজি !'

বাইরে মার্কিন গাড়িটার আওয়াজ যখন মিলিয়ে এল তখন অসমঞ্জবাবু ব্রাউনীকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে খাটের উপর রেখে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর হাসির কারণটা ঠিক বলিনি রে, ব্রাউনী ?'

ব্রাউনী ছোট্ট করে হেসে দিল—ফিক্।

অর্থাৎ ঠিক।

ক্লাস ফ্রেণ্ড

সকাল সোয়া নটা।

মোহিত সরকার সবেমাত্র টাইয়ে ফাঁসটা পরিয়েছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী অরুণা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমার ফোন।'

'এই সময় আবার কে ?'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় অফিসে পৌঁছানর অভ্যাস মোহিত সরকারের ; ঠিক বেরোনর মুখে ফোন এসেছে শুনে স্বভাবতই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

অরুণাদেবী বললেন, 'বলছে তোমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত।'

'ইস্কুলে ? বোঝ !—নাম বলেছে ?'

'বলল জয় বললেই বুঝবে !'

ত্রিশ বছর আগে ইস্কুল ছেড়েছেন মোহিত সরকার। ক্লাসে ছিল জনা চল্লিশেক ছেলে। খুব মন দিয়ে ভাবলে হয়ত তাদের মধ্যে জনা বিশেকের নাম মনে পড়বে, আর সেই সঙ্গে চেহারাও। জয় বা জয়দেবের নাম ও চেহারা দুটোই ভাগ্যক্রমে মনে আছে, কারণ সে ছিল ক্লাসে সেরা ছেলেদের মধ্যে একজন। পরিষ্কার ফুটফুটে চেহারা, পড়াশুনায় ভালো, ভালো হাইজাম্প দিত, ভালো তাসের ম্যাজিক দেখাত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা আবৃত্তি করে একবার মেডেল পেয়েছিল। স্কুল ছাড়ার পরে তার আর কোনো খবর রাখেননি মোহিত সরকার। তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে এককালে বন্ধুত্ব থাকলেও এত কাল ছাড়াছাড়ির পর তিনি আর কোনো টান অনুভব করছেন না তাঁর ইস্কুলের সহপাঠীর প্রতি।

মোহিত অগত্যা টেলিফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো !'

'কে, মোহিত ? চিনতে পারছ ভাই ? আমি সেই জয়—জয়দেব বোস। বালিগঞ্জ স্কুল।'

'গলা চেনা যায় না, তবে চেহারাটা মনে পড়ছে। কী ব্যাপার ?'

'তুমি তো এখন বড় অফিসার ভাই ; নামটা যে মনে রেখেছ এটাই খুব !'

'ওসব থাক—এখন কী ব্যাপার বল।'

'ইয়ে, একটু দরকার ছিল। একবার দেখা হয় ?'

'কবে ?'

'তুমি যখন বলবে। তবে যদি তাড়াতাড়ি হয় তাহলে...'

'তাহলে আজই কর। আমার ফিরতে ফিরতে ছ'টা হয়। সাতটা নাগাদ আসতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব। থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। তখন কথা হবে।'

হালে কেনা হালকা নীল স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়িতে আপিস যাবার পথে মোহিত সরকার ইস্কুলের ঘটনা কিছু মনে আনার চেষ্টা করলেন। হেডমাস্টার গিরীন সুরের ঘোলাটে চাহনি আর গুরুগম্ভীর মেজাজ সত্ত্বেও স্কুলের দিনগুলি ভারী আনন্দের ছিল। মোহিত নিজেও ভাল ছাত্র ছিলেন। শঙ্কর, মোহিত আর জয়দেব—এই তিনজনের মধ্যেই রেশারেশি ছিল। ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড তিনজনে যেন পালা করে হত। ক্লাস সিক্স থেকে মোহিত সরকার আর জয়দেব বোস একসঙ্গে পড়েছেন। অনেক সময় এক বেঞ্চিতেই পাশাপাশি বসতেন দুজন। ফুটবলেও পাশাপাশি স্থান ছিল দুজনের ; মোহিত খেলতেন রাইট-ইন, জয়দেব রাইট-আউট ; তখন মোহিতের মনে হত এই বন্ধুত্ব বুঝি চিরকালের। কিন্তু ইস্কুল ছাড়ার পরেই দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। মোহিতের বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতার নাম করা ব্যারিস্টার। ইস্কুল শেষ করে মোহিত ভালো কলেজে ঢুকে ভালো পাশ করে দু'বছরের মধ্যেই ভালো সদাগরী আপিসে চাকরি পেয়ে যায়। জয়দেব চলে যায় অন্য শহরের অন্য কলেজে, কারণ তার বাবার ছিল বদলীর চাকরি। তারপর, আশ্চর্য ব্যাপার, মোহিত দেখেন যে তিনি আর জয়দেবের অভাব বোধ করছেন না ; তার জায়গায় নতুন বন্ধু জুটেছে কলেজে। তারপর সেই বন্ধু বদলে গেল যখন ছাত্রজীবন শেষ করে মোহিত চাকরির জীবনে প্রবেশ করলেন। এখন তিনি তাঁর আপিসের চারজন মাথার মধ্যে একজন ; এবং তাঁর সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল তাঁরই একজন সহকর্মী। স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র প্রজ্ঞান সেনগুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্লাবে দেখা হয় ; সেও ভালো আপিসে বড় কাজ করে। আশ্চর্য, ইস্কুলের স্মৃতির মধ্যে কিন্তু প্রজ্ঞানের কোনো স্থান নেই। অথচ জয়দেব—যার সঙ্গে ত্রিশ বছর দেখাই হয়নি—স্মৃতির অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। এই সত্যটা মোহিত পুরানো কথা ভাবতে ভাবতে বেশ ভালো করে বুঝতে পারলেন।

মোহিতের অফিসটা সেন্ট্রাল এভিনিউতে। চৌরঙ্গী আর সুরেন ব্যানার্জির

সংযোগস্থলের কাছাকাছি আসতেই গাড়ির ভিড়, মোটরের হর্ন আর বাসের ধোঁয়া মোহিত সরকারকে স্মৃতির জগৎ থেকে হুড়মুড়িয়ে বাস্তব জগতে এনে ফেলল। হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়াতে মোহিত বুঝলেন যে তিনি আজ মিনিট তিনেক লেট হবেন।

অফিসের কাজ সেরে সন্ধ্যায় তাঁর লী রোডের বাড়িতে যখন ফিরলেন মোহিত, তখন তাঁর মনে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের স্মৃতির কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। সত্যি বলতে কী, তিনি সকালের টেলিফোনের কথাটাও বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন ; সেটা মনে পড়ল যখন বেয়ারা বিপিন বৈঠকখানায় এসে তাঁর হাতে রুলটানা খাতার পাতা ভাঁজ করে ছেঁড়া একটা চিরকুট দিল। তাতে ইংরিজিতে লেখা—'জয়দেব বোস, অ্যাজ পার অ্যাপয়েন্টমেন্ট'।

রেডিওতে বি বি সি-র খবরটা বন্ধ করে মোহিত বিপিনকে বললেন, 'ভেতরে আসতে বল'—আর বলেই মনে হল, জয় এতকাল পরে আসছে, তার জন্য কিছু খাবার আনিয়ে রাখা উচিত ছিল। আপিস-ফেরতা পার্ক স্ট্রীট থেকে কেক-পেস্ট্রি জাতীয় কিছু কিনে আনা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কিন্তু খেয়াল হয়নি। তাঁর স্ত্রী কি আর নিজে খেয়াল করে এ কাজটা করেছেন ?

'চিনতে পারছ ?'

গলার স্বর শুনে, আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে চেয়ে মোহিত সরকারের যে প্রতিক্রিয়াটা হল সেটা সিঁড়ি উঠতে গিয়ে শেষ ধাপ পেরোনোর পরেও আরেক ধাপ আছে মনে করে পা ফেললে হয়।

চৌকাঠ পেরিয়ে যিনি ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর পরনে ছাই রঙের বেখাপ্পা ঢলঢলে সুতির প্যান্টের উপর হাতকাটা সস্তা ছিটের সার্ট দুটির কোনোটিও কস্মিনকালে ইস্তিরির সংস্পর্শে এসেছে বলে মনে হয় না। সার্টের কলারের ভিতর দিয়ে যে মুখটি বেরিয়ে আছে তার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও মোহিত তাঁর স্মৃতির জয়দেবের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। আগন্তুকের চোখ কোটরে বসা, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে ঝামা, গাল তোবড়ানো, থুতনিতে অন্তত তিন দিনের কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার উপরাংশ মসৃণ, কানের পাশে কয়েক গাছা অবিন্যস্ত পাকা চুল। প্রশ্নটা হাসিমুখে করায় ভদ্রলোকের দাঁতের পাটিও দেখতে পেয়েছেন মোহিত সরকার, এবং মনে হয়েছে পান-খাওয়া ক্ষয়ে-যাওয়া অমন দাঁত নিয়ে হাসতে হলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসা উচিত।

'অনেক বদলে গেছি, না ?'

'বোসো।'

মোহিত এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামনের সোফায় আগন্তুক বসার পর

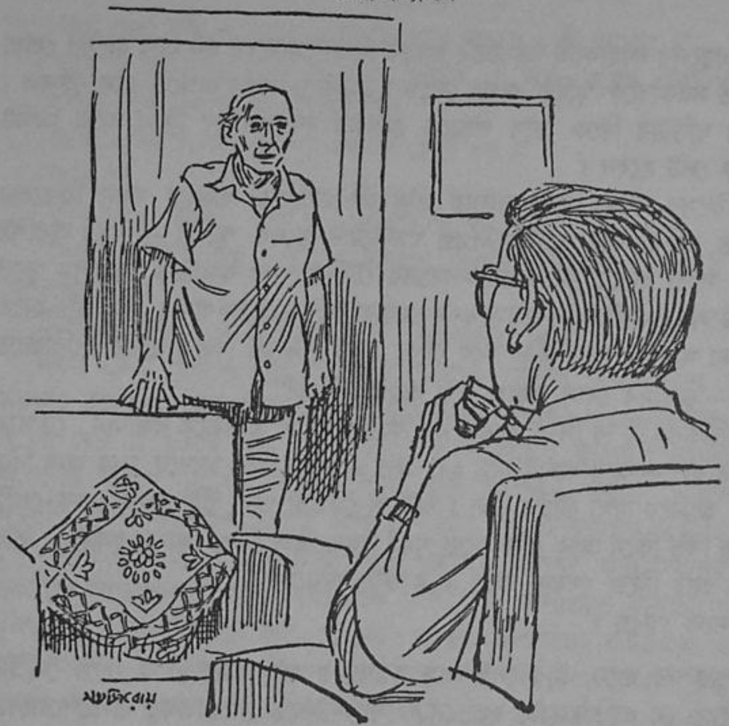

মোহিতও তাঁর নিজের জায়গায় বসলেন। মোহিতের নিজের ছাত্রজীবনের কয়েকটা ছবি তাঁর অ্যালবামে আছে ; সেই ছবিতে চোদ্দ বছর বয়সের মোহিতের সঙ্গে আজকের মোহিতের আদল বার করতে অসুবিধা হয় না। তাহলে এঁকে চেনা এত কঠিন হচ্ছে কেন ? ত্রিশ বছরে একজনের চেহারায় এত পরিবর্তন হয় কি ?

'তোমাকে কিন্তু বেশ চেনা যায়। রাস্তায় দেখলেও চিনতে পারতাম'—ভদ্রলোক কথা বলে চলেছেন—'আসলে আমার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কলেজে পড়তে পড়তে বাবা মারা গেলেন, আমি পড়া ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরতে শুরু করি। তারপর, ব্যাপার তো বোঝই। কপাল আর ব্যাকিং এ দুটোই যদি না থাকে তাহলে আজকের দিনে একজন ইয়ের পক্ষে...'

'চা খাবে ?'

'চা ? হ্যাঁ, তা...'

মোহিত বিপিনকে ডেকে চা আনতে বললেন, আর সেই সঙ্গে এই ভেবে

আশ্বস্ত হলেন যে কেক মিষ্টি যদি নাও থাকে তাহলেও ক্ষতি নেই ; এনার পক্ষে বিস্কুটই যথেষ্ট।

'ওঃ!'—ভদ্রলোক বলে চলেছেন, 'আজ সারাদিন ধরে কত পুরানো কথাই না ভেবেছি, জান মোহিত!'

মোহিত নিজেও যে কিছুটা সময় তাই করেছেন সেটা আর বললেন না।

'এল সি এম, জি সি এম-কে মনে আছে ?'

মোহিতের মনে ছিল না, কিন্তু বলতেই মনে পড়ল। এল সি এম হলেন পি-টির মাস্টার লালচাঁদ মুখুজ্যে। আর জি সি এম হলেন অঙ্কের স্যার গোপেন মিত্তির।

'আমাদের খাবার জলের ট্যাঙ্কের পেছনটায় দুজনকে জোর করে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে কে বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলেছিল মনে আছে ?'

ঠোঁটের কোণে একটা হাল্‌কা হাসি এনে মোহিত বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর মনে আছে। আশ্চর্য, এগুলোতো সবই সত্যি কথা। ইনি যদি জয়দেব না হন তাহলে এত কথা জানলেন কী করে ?'

'স্কুল লাইফের পাঁচটা বছরই আমার জীবনের বেস্ট টাইম, জান ভাই,' বললেন আগন্তুক, 'তেমন দিন আর আসবে না।'

মোহিত একটা কথা না বলে পারলেন না।

'তোমার তো মোটামুটি আমারই বয়স ছিল বলে মনে পড়ে'—

'তোমার চেয়ে তিন মাসের ছোট।'

'—তাহলে এমন বুড়োলে কী করে ? চুলের দশা এমন হল কী করে ?'

'স্ট্রাগ্‌ল, ভাই স্ট্রাগল,' বললেন আগন্তুক। 'অবিশ্যি টাকটা আমাদের ফ্যামেলির অনেকেরই আছে। বাপ-ঠাকুর্দা দুজনেরই টাক পড়ে যায় পঁয়ত্রিশের মধ্যে ! গাল ভেঙেছে হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য, আর প্রপার ডায়েটের অভাবে। তোমাদের মতো তো টেবিল চেয়ারে বসে কাজ নয় ভাই। কারখানায় কাজ করেছি সাত বছর, তারপর মেডিক্যাল সেলসম্যান, ইনশিওরেন্সের দালালি, এ দালালি, সে দালালি ! এক কাজে টিকে থাকব সেতো আর কপালে লেখা নেই। তাঁতের মাকুর মতো একবার এদিক একবার ওদিক। কথায় বলে—শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়—অথচ তাতে শেষ অবধি শরীরটা গিয়ে কী দাঁড়ায় তাতো আর বলে না। সেটা আমায় দেখে বুঝতে হবে।'

বিপিন চা এনে দিল। সঙ্গে প্লেটে সন্দেশ আর সিঙ্গাড়া। গিন্নীর খেয়াল আছে বলতে হবে। ক্লাস ফ্রেণ্ডের এই ছিরি দেখলে কী ভাবতেন সেটা মোহিত আন্দাজ করতে পারলেন না।

'তুমি খাবে না ?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। মোহিত মাথা নাড়লেন। —'আমি

এইমাত্র খেয়েছি।'

'একটা সন্দেশ ?'

'নাঃ, আপ—তুমিই খাও।'

ভদ্রলোক সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতেই বললেন, 'ছেলেটার পরীক্ষা সামনে। অথচ এমন দশা, জান মোহিত ভাই, ফী-এর টাকাটা যে কোত্থেকে আসবে তা তো বুঝতে পারছি না।'

আর বলতে হবে না। মোহিত বুঝে নিয়েছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল এঁর আসার কারণটা। সাহায্য প্রার্থনা। আর্থিক সাহায্য। কত চাইবেন ? বিশ-পঁচিশ হলে দিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ না দিলেই যে উৎপাতের শেষ হবে এমন কোনো ভরসা নেই।

'আমার ছেলেটা খুব ব্রাইট, জান ভাই। পয়সার অভাবে তার পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এ কথাটা ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না।'

দ্বিতীয় সিঙ্গাড়াটাও উঠে গেল প্লেট থেকে। মোহিত সুযোগ পেলেই জয়দেবের সেই ছেলে বয়সের চেহারাটার সঙ্গে আগন্তুকের চেহারা মিলিয়ে দেখছেন, আর ক্রমেই তাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে যে সেই বালকের সঙ্গে এই প্রৌঢ়ের কোনো সাদৃশ্য নেই।

'তাই বলছিলাম, ভাই', চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন আগন্তুক, 'অন্তত শ'খানেক কি শ'দেড়েক যদি এই পুরানো বন্ধুর হাতে তুলে দিতে পার, তাহলে—'

'ভেরি সরি।'

'অ্যাঁ ?'

টাকার কথাটা উঠলেই সরাসরি না করে দেবেন এটা মোহিত মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল ব্যাপারটা এতটা রূঢ়ভাবে না করলেও চলত। তাই নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়ে গলাটাকে আরেকটু নরম করে বললেন, 'সরি ভাই। আমার কাছে জাস্ট নাউ ক্যাশের একটু অভাব।'

'আমি কাল আসতে পারি। এনি টাইম। তুমি যখনই বলবে।'

'কাল আমি একটু কলকাতার বাইরে যাব। ফিরব দিন তিনেক পরে। তুমি রোববার এস।'

'রবিবার...'

আগন্তুক যেন খানিকটা চুপসে গেলেন। মোহিত মনস্থির করে ফেলেছেন। ইনিই যে জয়, চেহারায় তার কোনো প্রমাণ নেই। কলকাতার মানুষ ধাপ্পা দিয়ে টাকা রোজগারের হাজার ফিকির জানে। ইনি যদি জালিয়াত হন ? হয়ত আসল জয়দেবকে চেনেন। তার কাছ থেকে ত্রিশ বছর আগের বালিগঞ্জ স্কুলের কয়েকটা ঘটনা জেনে নেওয়া আর এমন কী কঠিন কাজ ?

'রবিবার কখন আসব ?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

'সকালের দিকেই ভাল। এই নটা সাড়ে নটা।'

শুক্রবার ঈদের ছুটি। মোহিতের আগে থেকেই ঠিক আছে বারুইপুরে এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে উইক-এন্ড কাটিয়ে আসবেন। দুদিন থেকে রবিবার রাত্রে ফেরা ; সুতরাং ভদ্রলোক সকালে এলে তাঁকে পাবেন না। এই প্রতারণাটুকুরও প্রয়োজন হত না যদি মোহিত সোজাসুজি মুখের উপর না করে দিতেন। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের দ্বারা এ জিনিসটা হয় না। মোহিত এই দলেই পড়েন। রবিবার তাঁকে না পেয়ে যদি আবার আসেন ভদ্রলোক, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করার কোনো অজুহাত বার করবেন মোহিত সরকার। তারপর হয়ত আর বিরক্ত হতে হবে না।

আগন্তুক চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখতেই ঘরে আরেকজন পুরুষ এসে ঢুকলেন। ইনি মোহিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু বাণীকান্ত সেন। আরো দু'জন আসার কথা আছে, তারপর তাসের আড্ডা বসবে। এটা রোজকার ঘটনা। বাণীকান্ত ঘরে ঢুকেই যে আগন্তুকের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিলেন সেটা মোহিতের দৃষ্টি এড়াল না। আগন্তুকের সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়ের ব্যাপারটা মোহিত অম্লান বদনে এড়িয়ে গেলেন।

'আচ্ছা, তাহলে আসি...' আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'তুই এই উপকারটা করলে সত্যিই গ্রেটফুল থাকব ভাই, সত্যিই।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই বাণীকান্ত বন্ধুর দিকে ফিরে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'এই লোক তোমাকে তুই করে বলছে—ব্যাপারটা কী ?'

'এতক্ষণ তুমি বলছিল, শেষে তোমাকে শুনিয়ে হঠাৎ তুই বলল।'

'লোকটা কে ?'

মোহিত উত্তর না দিয়ে বুক শেল্‌ফ থেকে একটা পুরানো ফোটো অ্যালবাম বার করে তার একটা পাতা খুলে বাণীকান্তর দিকে এগিয়ে দিল।

'একি তোমার ইস্কুলের গ্রুপ নাকি ?'

'বোট্যানিক্‌সে পিকনিকে গিয়েছিলাম,' বললেন মোহিত সরকার।

'কারা এই পাঁচজন ?'

'আমাকে চিনতে পারছ না ?'

'দাঁড়াও, দেখি।'

অ্যালবামের পাতাটাকে চোখের কাছে নিয়ে বাণীকান্ত সহজেই তাঁর বন্ধুকে চিনে ফেললেন।

'এবার আমার ডানপাশের ছেলেটিকে দেখ তো ভালো করে !'

ছবিটাকে আরো চোখের কাছে এনে বাণীকান্ত বললেন, 'দেখলাম।'

মোহিত বললেন, 'ইনি হচ্ছেন যিনি এইমাত্র উঠে গেলেন।'

'ইস্কুল থেকেই কি জুয়া ধরেছিলেন নাকি ?' —অ্যালবামটা সশব্দে বন্ধ করে পাশের সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন বাণীকান্ত। —'ভদ্রলোককে অন্তত বত্রিশবার দেখেছি রেসের মাঠে।'

'সেটাই স্বাভাবিক', বললেন মোহিত সরকার। তারপর আগন্তুকের সঙ্গে কী কথা হল সেটা সংক্ষেপে বললেন।

'পুলিশে খবর দে', বললেন বাণীকান্ত, 'চোর জোচ্চোর জালিয়াতের ডিপো হয়েছে কলকাতা শহর। এই ছবির ছেলে আর ওই জুয়াড়ি এক লোক হওয়া ইম্পসিবল।'

মোহিত হালকা হাসি হেসে বললেন, 'রোববার এসে আমাকে না পেলেই ব্যাপারটা বুঝবে। তারপর আর উৎপাত করবে বলে মনে হয় না।'

বারুইপুরে বন্ধুর পুকুরের মাছ, পোলট্রির মুরগীর ডিম, আর গাছের আম জাম ডাব পেয়ারা খেয়ে, বুকল গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি পেতে বুকে বালিস নিয়ে তাস খেলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করে রবিবার রাতএগারোটায় বাড়ি ফিরে মোহিত সরকার বিপিন বেয়ারার কাছে শুনলেন যে সেদিন যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি আজ সকালে আবার এসেছিলেন। —'যাবার সময় কিছু বলে গেছেন কি ?'

'আজ্ঞে না,' বলল বিপিন।

যাক্, নিশ্চিন্ত ! একটা সামান্য কৌশল, কিন্তু তাতে কাজ দিয়েছে অনেক। আর আসবে না। আপদ গেছে।

কিন্তু না। আপদ সেদিনের জন্য গেলেও, পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ মোহিত যখন বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তখন বিপিন আবার একটিভাঁজ করা চিরকুট এনে দিল তাকে। মোহিত খুলে দেখলেন তিন লাইনের একটি চিঠি।

ভাই মোহিত,

আমার ডান পা-টা মচকেছে, তাই ছেলেকে পাঠাচ্ছি। সাহায্য স্বরূপ সামান্য কিছুও এর হাতে দিলে অশেষ উপকার হবে। আশা করি হতাশ করবে না।—

ইতি জয়

মোহিত বুঝলেন এবার আর রেহাই নেই। তবে সামান্য মানে সামান্যই, এই স্থির করে তিনি বেয়ারাকে বললেন, 'ডাক ছেলেটিকে।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটি তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে দরজা দিয়ে ঢুকে মোহিতের দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে আবার কয়েক পা পিছিয়ে

গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার দিকে মিনিট খানেক চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'বোস।'

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ ভাব করে একটি সোফার এক কোণে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে বসল।

'আমি আসছি এক্ষুনি।'

মোহিত দোতলায় গিয়ে স্ত্রীর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে আলমারি খুলে দেরাজ থেকে চারটে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে একটা খামে পুরে আলমারি বন্ধ করে আবার নিচের বৈঠকখানায় ফিরে এলেন।

'কী নাম তোমার ?'

'শ্রীসঞ্জয়কুমার বোস।'

'এতে টাকা আছে। সাবধানে নিতে পারবে ?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কোথায় নেবে ?'

'বুক পকেটে।'

'ট্রামে ফিরবে, না বাসে ?'

'হেঁটে।'

'হেঁটে ? কোথায় বাড়ি তোমার ?'

'মির্জাপুর স্ট্রীট।'

'এত দূর হাঁটবে ?'

'বাবা বলেছেন হেঁটে ফিরতে।'

'তার চেয়ে এক কাজ কর। ঘণ্টা খানেক বোস, চা-মিষ্টি খাও, অনেক বই-টই আছে, দেখ—আমি ন'টায় অফিসে যাব, আমায় নামিয়ে দিয়ে আমার গাড়ি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। তুমি বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবে তো?'

ছেলেটি আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মোহিত বিপিনকে ডেকে ছেলেটির জন্য চা দিতে বলে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হতে দোতলায় রওনা হলেন।

ভারী হালকা বোধ করছেন তিনি, ভারী প্রসন্ন।

জয়কে দেখে না চিনলেও, তিনি তার ছেলে সঞ্জয়ের মধ্যে তাঁর ত্রিশ বছর আগের ক্লাস ফ্রেণ্ডটিকে ফিরে পেয়েছেন।

বৃহচ্চঞ্চু

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে তাঁর আপিসের যেখানে বসে তুলসীবাবু কাজ করেন, তার পাশেই জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশে অনেকখানি দেখা যায়। সেই আকাশে এক বর্ষাকালের সকালে যখন জোড়া রামধনু দেখা দিল, ঠিক তখনই তুলসীবাবুর পাশের টেবিলে বসা জগন্ময় দত্ত পানের পিক ফেলতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আকাশে চোখ পড়াতে ভদ্রলোক 'বাঃ' বলে তুলসীবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখে যান মশাই, এ জিনিস ডেইলি দেখবেন না।'

তুলসীবাবু উঠে গিয়ে আকাশপানে চেয়ে বললেন, 'কিসের কথা বলছেন?'

'কেন, ডবল রেনবো!' অবাক হয়ে বললেন জগন্ময়বাবু। 'আপনি কি কালার ব্লাইণ্ড নাকি মশাই?'

তুলসীবাবু জায়গায় ফিরে এলেন। —'এ জিনিসও কাজ ফেলে উঠে গিয়ে দেখতে হবে? একটার জায়গায় দুটো কেন, পঁচিশটা রামধনু উঠলেও তাতে আশ্চর্যের কী আছে জানি না মশাই। লোয়ার সারকুলার রোডে জোড়া গির্জা আছে তো; তাহলে তো তার সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।'

অবাক হবার ক্ষমতাটা সকলের সমান থাকে না ঠিকই, কিন্তু তুলসীবাবুর মধ্যে আদৌ আছে কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 'আশ্চর্য' বিশেষণটা তিনি কেবল একটি ব্যাপারেই প্রয়োগ করেন; সেটা হল মনসুরের দোকানের মোগলাই পরোটা আর কাবাব। অবিশ্যি সে খবরটা তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু প্রদ্যোতবাবু ছাড়া আর কেউ জানেন না।

এমনিধারা লোক বলেই হয়ত দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলে কবিরাজী গাছগাছড়া খুঁজতে গিয়ে একটা অতিকায় ডিমের সন্ধান পেয়েও তুলসীবাবু অবাক হলেন না।

কবিরাজীটা তুলসীবাবু ধরেছেন বছর পনেরো হল। বাবা ত্রৈলোক্য সেন ছিলেন নাম-করা কবিরাজ। তুলসীবাবুর আসল রোজগার আরবাথনট কোম্পানীর মধ্যপদস্থ কর্মচারী হিসেবে। কিন্তু পৈতৃক পেশাটাকে তিনি সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। সম্প্রতি ঝোঁকটা একটু বেড়েছে, কারণ কলকাতার দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ওষুধে আরাম পাওয়ার ফলে তিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এবারে দণ্ডকারণ্যে আসার পিছনেও ছিল কবিরাজী। জগদলপুরের মাইল ত্রিশেক উত্তরে এক পাহাড়ের গুহায় এক সাধু বাস করেন। তাঁর সন্ধানে নাকি আশ্চর্য ভালো কবিরাজী ওষুধ আছে এ খবর তুলসীবাবু কাগজে পড়েছেন। বিশেষত রক্তের চাপ কমানোর জন্য একটা ওষুধ আছে যেটা নাকি সর্পগন্ধার চেয়েও ভালো। তুলসীবাবু মাঝে মাঝে ব্লাডপ্রেসারে ভোগেন। সর্পগন্ধায় বিশেষ কাজ দেয়নি, আর অ্যালোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি তিনি মানেন না।

এই অভিযানে তুলসীবাবুর সঙ্গে আছেন প্রদ্যোতবাবু। তুলসীবাবুর বিস্ময়বোধের অভাবে প্রদ্যোতবাবুর যে ধৈর্যচ্যুতি হয় না তা নয়। একদিন তো তিনি বলেই বসলেন, 'মশাই, কল্পনাশক্তি থাকলে মানুষে কোনো কোনো ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারে না। আপনি চোখের সামনে ভূত দেখলেও বলবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে।' তুলসীবাবু শান্ত ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'অবাক না হলে অবাক হবার ভান করাটা আমার কাছে আদিখ্যেতা বলে মনে হয়। ওটা আমি পছন্দ করি না।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'জনের পরস্পরের প্রতি একটা টান ছিল।

জগদলপুরের একটা হোটেলে আগে থেকে ঘর ঠিক করে নবমীর দিন গিয়ে হাজির হলেন দুই বন্ধু। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ মেলে বিজয়নগরম, সেখান থেকে আবার ট্রেন বদলে জগদলপুর। মাদ্রাজ মেলের থ্রি-টিয়ার কামরায় দুটি বিদেশী ছোকরা উঠেছিল, তারা নাকি সুইডেনের অধিবাসী। তাদের মধ্যে একজন এত ঢ্যাঙা যে তার মাথা কামরার সিলিং-এ ঠেকে যায়। প্রদ্যোতবাবু হাইট জিগ্যেস করাতে ছোকরাটি বলল, 'টু মিটারস অ্যান্ড সিক্স সেন্টিমিটারস।' অর্থাৎ প্রায় সাত ফুট। প্রদ্যোতবাবু বাকি পথ এই তরুণ দানবটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেননি। তুলসীবাবু কিন্তু অবাক হননি। তাঁর মতে ওদের ডায়েটে এমন হওয়াটা নাকি কিছুই আশ্চর্যের না।

প্রায় মাইল খানেক পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে শ' পাঁচেক ফুট পাহাড় উঠে তবে ধুমাইবাবার গুহায় পৌঁছতে হয়। বিশাল গুহা, দশ পা ভিতরে গেলেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেটা যে শুধু ধুমাইবাবার ধুনুচির ধোঁয়ার জন্য তা নয়; এমনিতেই গুহায় আলো প্রবেশ করে না বললেই চলে। প্রদ্যোতবাবু অপার বিস্ময়ে দেখছিলেন গুহার সর্বত্র স্ট্যাল্যাকটাইট-স্ট্যাল্যাগমাইটের ছড়াছড়ি।

তুলসীবাবুর দৃষ্টি সেদিকে নেই, কারণ তাঁর লক্ষ্য কবিরাজী ওষুধ। ধুমাইবাবা যে গাছের কথা বললেন তার নাম চক্রপর্ণ।এ নাম তুলসীবাবু কোনোদিন শোনেননি বা পড়েননি। গাছ নয়, গাছড়া—আর সে গাছড়া নাকি কেবল দণ্ডকারণ্যের একটি বিশেষ জায়গায় ছাড়া আর কোথাও নেই, আর সেই জায়গাটারও একটা বিশেষত্ব আছে সেটা তুলসীবাবু নাকি গেলেই বুঝতে পারবেন। কী বিশেষত্ব সেটা আর বাবাজী ভাঙলেন না। তবে কোন পথে কী ভাবে সেখানে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

গুহা থেকে বেরিয়েই গাছের সন্ধানে রওনা দিলেন তুলসীবাবু। প্রদ্যোতবাবুর সঙ্গ দিতে কোনো আপত্তি নেই ; তিনি নিজে এককালে শিকারের ধান্দায় অনেক পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন। বন্যপশু সংরক্ষণের হিড়িকের পর থেকে বাধ্য হয়ে শিকার ছাড়লেও জঙ্গলের মোহ কাটাতে পারেননি।

সাধুবাবার নির্দেশ অব্যর্থ। আধঘণ্টা অনুসন্ধানের পরেই একটা নালা পড়ল আর নালা পেরিয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যেই যেমন বর্ণনা ঠিক তেমনি একটা বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া নিম গাছের গুঁড়ি থেকে সাত পা দক্ষিণে চক্রপর্ণের সন্ধান মিলল। কোমর অবধি উঁচু গাছ, আধুলির সাইজের গোল পাতাগুলির মাঝখানে একটি করে গোলাপী চাকতি।

'এ কোথায় এলাম মশাই ?' প্রদ্যোতবাবু মন্তব্য করলেন।

'কেন, কী হল ?'

'এখানের অধিকাংশ গাছই দেখছি অচেনা,' বললেন প্রদ্যোতবাবু!'—আর জায়গাটা কী রকম স্যাঁৎসেঁতে দেখছেন ? বনের বাকি অংশের সঙ্গে যেন কোনো মিলই নেই।'

পায়ের তলায় ভিজে ভিজে ঠেকছিল বটে তুলসীবাবুর, কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে কেন ? কলকাতা শহরের মধ্যে এ পাড়া ও পাড়ায় তাপমাত্রার ফারাক হয়—যেমন ভবানীপুরের চেয়ে টালিগঞ্জে শীত বেশি। তাহলে বনের এক অংশ থেকে আরেক অংশে তফাত হবে না কেন ? এতো প্রকৃতির খেয়াল।

তুলসীবাবু কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে গাছের দিকে উপুড় হয়েছেন, এমন সময় প্রদ্যোতবাবুর বিস্ময়সূচক প্রশ্ন তাঁকে বাধা দিল।

'ওটা আবার কী ?'

তুলসীবাবু দেখেছেন জিনিসটা, কিন্তু গ্রাহ্য করেননি। বললেন, 'কিছুর ডিমটিম হবে আর কী !'

প্রদ্যোতবাবুর প্রথমে পাথর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই বুঝলেন ডিম ছাড়া আর কিছুই না। হলুদের উপর চকোলেটের ডোরা। তারই ফাঁকে ফাঁকে নীলের ছিটেফোঁটা। এত বড় ডিম কিসের হতে পারে ? ময়াল

সাপ-টাপ নয় তো ?

ইতিমধ্যে তুলসীবাবু গাছের খানিকটা তাঁর ঝোলায় পুরে নিয়েছেন। ডাল সমেত আরো কিছু পাতা নেবার ইচ্ছে ছিল ; কিন্তু সেটা হল না। ডিম বাবাজী ঠিক এই সময়ই ফুটবেন বলে মনস্থ করলেন।

খোলা চৌচির হবার শব্দটা শুনে প্রদ্যোতবাবু চমকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, ডিম ফুটেছে, এবং শাবকের মাথা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সাপ নয়, কুমীর নয়, কচ্ছপ নয়—পাখি।

এবার ছানার সমস্ত শরীরটা বেরিয়ে এসে দুটি শীর্ণ ঠ্যাঙে ভর করে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে। আয়তন ডিমেরই অনুযায়ী ; শাবক অবস্থাতেও দিব্যি একটা মুরগীর সমান বড়। প্রদ্যোতবাবুর এককালে নিউ মার্কেটে পাখির সন্ধানে যাতায়াত ছিল। বাড়িতে পোষা বুলবুলি আছে, ময়না আছে। কিন্তু এত বড় ঠোঁট, এত লম্বা পা, গায়ের এমন বেগুনী রং আর জন্মানোমাত্র এমন সপ্রতিভ ভাব তিনি কোনো পাখির মধ্যে দেখেননি।

তুলসীবাবুর কিন্তু ছানা সম্বন্ধে মনে কোনো কৌতূহল নেই। তিনি ইতিমধ্যে গাছের আরো বেশ খানিকটা অংশ ঝোলায় পুরে ফেলেছেন।

প্রদ্যোতবাবু এদিক ওদিক চেয়ে পাখিটা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য না করে পারলেন না।

'আশ্চর্য ! ছানা আছে অথচ মা নেই, বাপ নেই। অন্তত কাছাকাছির মধ্যে তো দেখছি না।'

'ঢের আশ্চর্য হয়েছেন' ঝোলা কাঁধে নিয়ে বললেন তুলসীবাবু।—'তিনটে বাজে, এর পর ঝপ করে সন্ধে হয়ে যাবে।'

প্রদ্যোতবাবু কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পাখি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে তুলসীবাবুর সঙ্গে হাঁটা শুরু করলেন। তাঁদের গাড়ি অপেক্ষা করছে যেখানে, সেখানে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় আধ ঘন্টা।

পিছন থেকে শুকনো পাতার খসখসানি শুনে প্রদ্যোতবাবুই থেমে ঘাড় ঘোরালেন।

ছানাটা পিছু নিয়েছে।

'ও মশাই !'

এবার তুলসীবাবুও থেমে পিছন ফিরলেন। শাবকের দৃষ্টি সটান তুলসীবাবুর দিকেই।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে ছানাটা তুলসীবাবুর সামনেই থামল। তারপর গলা বাড়িয়ে তার বেমানান রকম বড় ঠোঁট দিয়ে তুলসীবাবুর ধুতির কোঁচার

একটা অংশে কামড়ে দিয়ে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

প্রদ্যোতবাবু কাণ্ড দেখে এতই অবাক যে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। শেষটায় যখন দেখলেন যে তুলসীবাবু ছানাটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঝোলায় পুরলেন, তখন আর চুপ থাকা যায় না।

'কী করছেন মশাই! একটা নামগোত্রহীন ধেড়ে পাখির ছানাকে থলেতে পুরে ফেললেন?'

'একটা কিছু পোষার শখ ছিল অনেকদিন থেকে,' আবার হাঁটতে শুরু করে বললেন তুলসীবাবু।—'নেড়ীকুত্তা পোষে লোকে দেখেননি? তাদের গোত্রটা কি খুব একটা জাহির করার ব্যাপার?'

প্রদ্যোতবাবু দেখলেন পাখির ছানাটা তুলসীবাবুর দোলায়মান ঝোলাটা থেকে গলা বার করে মিটিমিটি এদিক ওদিকে চাইছে।

তুলসীবাবু থাকেন মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে দোতলার একটি ফ্ল্যাটে। একা মানুষ, একটি চাকর আছে, নাম নটবর, আর জয়কেষ্ট বলে একটি রান্নার লোক। দোতালায় আরো একটি ফ্ল্যাট আছে। তাতে থাকেন নবরত্ন প্রেসের মালিক তড়িৎ সান্যাল। সান্যাল মশাইয়ের মেজাজ এমনিতেই খিট্‌খিটে, তার উপর লোড শেডিং-এ ছাপাখানাতে বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে বলে সব সময়ই যেন মারমুখো ভাব।

দু' মাস হল তুলসীবাবু দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে পাখির ছানাটিও এসেছে, আর আসার পর দিনই একটি তারের খাঁচা কিনে পাখিটিকে তার মধ্যে পুরে বারান্দার এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে। পাখির নামকরণও হয়েছে। তুলসীবাবু ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলেন, তাই সংস্কৃত নামের উপর তাঁর একটা দুর্বলতা আছে। নাম রেখেছিলেন বৃহচ্চঞ্চু; শেষ পর্যন্ত সেটা চঞ্চুতে এসে দাঁড়িয়েছে।

জগদলপুরে থাকতে পাখিকে ছোলা ছাতু পাঁউরুটি খাওয়াবার চেষ্টা করে তুলসীবাবু শেষে বুঝেছিলেন যে পাখিটি মাংসাশী। তার পর থেকে রোজ উচ্চিংড়ে আরশোলা ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে তাকে। সম্প্রতি যেন তাতে পাখির খিদে মিটছিল না। খাঁচার জালের উপর দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট চালিয়ে খড়াং খড়াং শব্দ তুলে তার ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছিল। শেষটায় বাজার থেকে মাংস কিনে এনে খাওয়াতে শুরু করে তুলসীবাবু তার খিদে মিটিয়েছেন। এখন নিয়মিত মাংস কিনে আনে নটবর, আর সেই মাংস খেয়েই বোধহয় পাখির আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুলসীবাবু গোড়াতেই বুদ্ধি করে পাখির অনুপাতে খাঁচাটা বড়ই কিনেছিলেন।

তাঁর মন বলেছিল এ পাখির জাত বেশ জাঁদরেল। খাঁচাটা মাথায় ছিল আড়াইফুট। কালই ভদ্রলোক লক্ষ করেছেন যে চঞ্চু সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার মাথা তারে ঠেকে যাচ্ছে। অথচ বয়স মাত্র দু'মাস। এইবেলা চটপট একটা বড় খাঁচার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

ভালো কথা—পাখির ডাক সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। এই ডাক শুনেই একদিন সকালে সান্যাল মশাই বারান্দার ওপারে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলেন। এমনিতে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাক্যালাপ নেই বললেই চলে; আজ কোনোমতে কাশির ধাক্কা সামলে নিয়ে তড়িৎ সান্যাল তুলসীবাবুর উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, —'খাঁচায় কী জানোয়ার রেখেছেন মশাই যে, ডাক ছাড়লে পিলে চমকে যায়?' পাখির ডাক শুনে জানোয়ারের কথাই মনে হয় তাতে ভুল নেই।

তুলসীবাবু সবে কলঘর থেকে বেরিয়ে অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন; হাঁক শুনে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তড়িৎবাবুকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'জানোয়ার নয়, পাখি। আর ডাক যেমনই হোক না কেন, আপনার হুলোরমতো রাত্তিরে ঘুমের ব্যাঘাত করে না।'

হুলোর কান্না আগে শোনা যেত না, সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

তুলসীবাবুর পালটা জবাবে বাক্যুদ্ধ আর এগোতে পারল না বটে, কিন্তু তড়িৎবাবুর গজগজানি থামল না। ভাগ্যিস খাঁচাটা থাকে তড়িৎবাবুর গণ্ডীর বাইরে; পাখির চেহারা দেখলে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া কী হত বলা শক্ত।

এই চেহারা তুলসীবাবুকে বিস্মিত না করলেও, তাঁর বন্ধু প্রদ্যোতবাবুকে করে বৈকি। আগে অফিসের বাইরে দুজনের মধ্যে দেখা কমই হত। মনসুরের দোকানে গিয়ে কাবাব পরোটা খাওয়াটা ছিল সপ্তাহে একদিনের ব্যাপার। প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে বাপ মা ভাই বোন আছে, সংসারের অনেক দায়দায়িত্ব আছে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য থেকে ফেরার পর থেকেই তাঁর মনটা বার বার চলে যায় তুলসীবাবুর পাখির দিকে। ফলে তিনি আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যায় চলে আসেন মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে।

পাখির দ্রুত আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে তার চেহারার পরিবর্তনও প্রদ্যোতবাবুকে বিস্মিত করে। এটা তুলসীবাবুর দৃষ্টি এড়ায় কী করে, বা না এড়ালেও তিনি এই নিয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন না কেন, সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। কোনো পাখির চোখের চাহনি যে এত নির্মম হতে পারে সেটা প্রদ্যোতবাবু ভাবতে পারেননি। চোখ দুটো হল্‌দে, আর সেই চোখে এক ভাবে একই দিকে মিনিটের পর মিনিট চেয়ে থাকাটা তাঁর ভারী অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। পাখির দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটিও স্বভাবতই বেড়ে চলেছে। কুচকুচে কালো মসৃণ ঠোঁট, ঈগলের ঠোঁটের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তবে আয়তনে প্রায় তিন গুণ বড়। এ পাখি

যে ওড়ে না সেটা যেমন ডানার সাইজ থেকে বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাঘেরমতো নখ সমেত শক্ত, সবল পা দুটো থেকে। অনেক পরিচিত লোকের কাছে পাখির বর্ণনা দিয়েছেন প্রদ্যোতবাবু, কিন্তু কেউই চিনতে পারেনি।

আজ রবিবার, এক ভাইপোর একটি ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন প্রদ্যোতবাবু। খাঁচার ভিতর আলো কম, তাই ফ্ল্যাশের প্রয়োজন। ছবি তোলার অভ্যাস ছিল এককালে। তারই উপর ভরসা করে খাঁচার দিকে তাগ করে ক্যামেরার শাটারটা টিপে দিলেন প্রদ্যোতবাবু। ফ্ল্যাশের চমকের সঙ্গে সঙ্গে পাখির আপত্তিসূচক চিৎকারে তাঁকে তিন হাত পেছিয়ে যেতে হল, আর সেই মুহূর্তেই মনে হল যে এর গলার স্বরটা রেকর্ড করে রাখা উচিত। উদ্দেশ্য আর কিছুই না—ছবি দেখিয়ে এবং ডাক শুনিয়ে যদি পাখিটাকে চেনাতে সুবিধে হয়। তাছাড়া প্রদ্যোতবাবুর মনে একটা খচখচানি রয়ে গেছে যেটা তুলসীবাবুর কাছে এখনো প্রকাশ করেননি ; কবে বা কোথায় মনে পড়ছে না, কিন্তু কোনো বই বা পত্রিকায় প্রদ্যোতবাবু একটি পাখির ছবি দেখেছেন যেটার সঙ্গে তুলসীবাবুর পাখির আশ্চর্য সাদৃশ্য। যদি কখনো সেই ছাপা ছবি আবার হাতে পড়ে তাহলে মিলিয়ে দেখতে সুবিধা হবে।

ছবি তোলার পরে চা খেতে খেতে তুলসীবাবু একটা কথা বললেন যেটা আগে বলেননি। চঞ্চু আসার কিছুদিন পর থেকেই নাকি এ বাড়িতে আর কাক-চড়ুই বসে না। 'খুব লাভ হয়েছে মশাই,' বললেন তুলসীবাবু, 'চড়ুইগুলো যেখানে-সেখানে বাসা করে উৎপাত করত। কাকে রান্নাঘর থেকে এটা-সেটা সরিয়ে নিত। আজকাল ওসব বন্ধ।'

'সত্যি বলছেন ?' —প্রদ্যোতবাবু যথারীতি অবাক।

'এই যে রইলেন এতক্ষণ, দেখলেন একটাও অন্য কোনো পাখি ?'

প্রদ্যোতবাবুর খেয়াল হল যে সত্যিই দেখেননি। 'কিন্তু আপনার চাকরবাকর টিকে আছে ? চঞ্চুবাবাজীকে বরদাস্ত করতে পারে তো ?'

'জয়কেষ্ট খাঁচার দিকে এগোয়-টেগোয় না,' বললেন তুলসীবাবু, 'তবে নটবর চিমটে করে মাংসের টুকরো ঢুকিয়ে দেয়। তার আপত্তি থাকলেও সে মুখে প্রকাশ করেনি। আর পাখি যদি দুষ্টুমি করেও, আমি একবারটি গিয়ে দাঁড়ালেই সে বশ মেনে যায়।—ইয়ে, আপনি ছবি তুললেন কী কারণে !'

প্রদ্যোতবাবু আসলে কারণটা চেপে গেলেন। বললেন, 'কোন্‌দিন মরে-টরে যাবে, একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা ভালো নয় কি ?'

প্রদ্যোতবাবুর ছবি প্রিন্ট হয়ে এল পরদিনই। তার মধ্যে থেকে ভালোটা নিয়ে দুটো এনলার্জমেন্ট করিয়ে একটা আপিসে তুলসীবাবুকে দিলেন, অন্যটা নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন মালেন স্ট্রীটে পক্ষিবিদ্ রণজয় সোমের বাড়ি। সম্প্রতি দেশ

পত্রিকায় সিকিমের পাখি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন সোম সাহেব।

কিন্তু তিনি পাখির ছবি দেখে চিনতে পারলেন না। কোথায় পাখিটা দেখা যায় জিগ্যেস করাতে প্রদ্যোতবাবু অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বললেন। —'ছবিটা ওসাকা থেকে আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছে। সেও নাকি পাখির নাম জানে না।'

তারিখটা ডায়রিতে নোট করে রাখলেন তুলসীবাবু। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। গত মাসেই কেনা সাড়ে চার ফুট উঁচু নতুন খাঁচায় রাখা সাড়ে তিন ফুট উঁচু পোষা পাখি বৃহচ্চঞ্চু গতকাল মাঝরাত্রে একটা কাণ্ড করে বসেছে।

একটা সন্দেহজনক শব্দে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল তুলসীবাবুর। কট্‌কট্ কটাং কটাং কট্‌কট্‌··· । ঘুম ভাঙার মিনিট খানেকের মধ্যে শব্দটা থেমে গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ।

মন থেকে সন্দেহটা গেল না। তুলসীবাবু মশারিটা তুলে খাট থেকে নেমে পড়লেন। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। তারই আলোতে চটিজোড়ায় পা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

টর্চের আলো খাঁচাটার উপর পড়তেই দেখলেন নতুন খাঁচার মজবুত তার ছিঁড়ে দিব্যি একটা বেরোনোর পথ তৈরি হয়ে গেছে।

খাঁচা অবিশ্যি খালি।

টর্চের আলো ঘুরে গেল বারান্দার উল্টো দিকে। চঞ্চু নেই।

সামনে সিঁড়ির মুখটাতে বারান্দা ডাইনে ঘুরে চলে গেছে তড়িৎবাবুর ঘরের দিকে। একটা শব্দ—

তুলসীবাবু রুদ্ধশ্বাসে বারান্দার মোড়ে গিয়ে আলো ফেললেন বিপরীত দিকে।

যা ভেবেছিলেন তাই। তড়িৎবাবুর হুলো চঞ্চুর ডাকসাইটে ঠোঁটের মধ্যে অসহায় বন্দী। মেঝেতে টর্চের আলোয় যেটা চিক্‌চিক করছে সেটা রক্ত ছাড়া আর কিছুই না। তবে হুলোটা এখনো জ্যান্ত সেটা তার চার পায়ের ছটফটানি থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে আলো চোখে পড়া এবং তুলসীবাবু ধমকের সুরে 'চঞ্চু' বলার সঙ্গে সঙ্গে পাখি ঠোঁট ফাঁক করে হুলোটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বড় বড় পা ফেলে ও-মাথা থেকে এ-মাথা এসে মোড় ঘুরে সটান গিয়ে ঢুকলো নিজের খাঁচার ভিতর।

এই বিভীষিকার মধ্যে তুলসীবাবু হাঁফ না ছেড়ে পারলেন না।

তড়িৎবাবুর ঘরের দরজায় তালা। সারা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি স্কুলপাঠ্য বই ছাপানোর ঝামেলা মিটিয়ে ভদ্রলোক দিন তিনেক হল চলে গেছেন কলকাতার বাইরে বিশ্রামের জন্য।

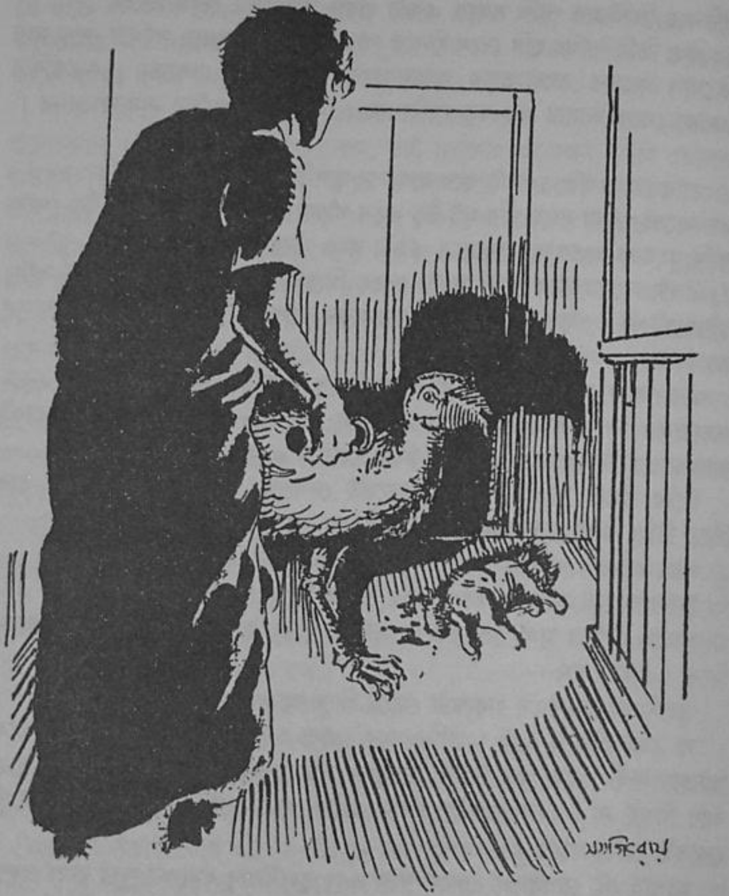

হুলোটাকে ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত। কত গাড়ি যায় রাতবিরেতে রাস্তা দিয়ে—কলকাতা শহরে দিনে রাতে কত কুকুর বেড়াল গাড়ি চাপা পড়ে মরে তার কি কোনো হিসেব আছে?

বাকি রাতটা ঘুম হল না তুলসীবাবুর।

পরদিন আপিস থেকে ঘন্টা খানেকের ছুটি নিয়ে রেলওয়ে বুকিং আপিসে গেলেন। একজন চেনা লোক ছিল কেরানিদের মধ্যে, তাই কাজ হাসিল হতে

বেশি সময় লাগল না। প্রদ্যোতবাবু একবার জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনার চঞ্চুর খবর কী মশাই? তাতে তুলসীবাবু ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিলেন—'ভালোই'। তারপর এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছিলেন, 'আপনার দেওয়া ছবিটা ভাবছি বাঁধিয়ে রাখব।'

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তুলসীবাবু দ্বিতীয়বার বিজয়নগরম হয়ে জগদলপুর হাজির হলেন। সঙ্গে ব্রেকভ্যানে এল একটা প্যাকিং কেস, যার গায়ে ফুটো থাকায় তার ভিতরের খাঁচার পাখির নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো অসুবিধা হয়নি।

জগদলপুর থেকে একটি টেম্পো ভাড়া করে সঙ্গে দুজন কুলি নিয়ে তুলসীবাবু রওনা দিলেন দণ্ডকারণ্যের সেই জঙ্গলের সেই বিশেষ জায়গাটির উদ্দেশে, যেখানে চঞ্চুকে শাবক অবস্থায় পেয়েছিলেন তিনি।

চেনা জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে কুলির মাথায় বাক্স চাপিয়ে আধঘন্টার পথ হেঁটে সেই ঝলসানো নিম গাছের ধারে গিয়ে তুলসীবাবু থামলেন। কুলিরাও মাথা থেকে বাক্স নামাল। তাদের আগে থেকেই ভালো বকশিশ দেওয়া ছিল, আর বলা ছিল যে প্যাকিং কেসটা তাদের খুলতে হবে।

পেরেক খুলে কাঠ চিরে ফেলে খাঁচা বাইরে বার করার পর তুলসীবাবু দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে পাখি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। এ হেন জীবের দর্শন পেয়ে কুলি দুটো স্বভাবতই পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে পালাল। কিন্তু তাতে তুলসীবাবুর কোনো উদ্বেগ নেই। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। খাঁচার ভিতর চঞ্চু একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। তার মাথা এখন সাড়ে চার ফুট উঁচু, খাঁচার ছাত ছুঁইছুঁই করছে।

'আসি রে চঞ্চু!'

আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। তুলসীবাবু একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টেম্পোর উদ্দেশে রওনা দিলেন।

তুলসীবাবু কোথায় যাচ্ছেন সেটা আপিসে কাউকে বলে যাননি। এমনকি প্রদ্যোতবাবুকেও না। পাওনা থেকে পাঁচদিন ছুটি নিয়ে মাঝ সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ে সোমবার আবার আপিসে হাজিরা দেবার পর প্রদ্যোতবাবু স্বভাবতই জিগ্যেস করলেন এই অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কারণ। তুলসীবাবু সংক্ষেপে জানালেন নৈহাটিতে তাঁর এক ভাগনীর বিয়ে ছিল।

এর দিন পনেরো পরে প্রদ্যোতবাবু একদিন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খাঁচা সমেত পাখি উধাও দেখে ভারী অবাক হলেন। জিগ্যেস করে উত্তর পেলেন, 'পাখি আর নেই।'

প্রদ্যোতবাবুর মনটা খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। তিনি নেহাতই হাল্‌কা ভাবে বলেছিলেন পাখি মরে যাবার কথা; এভাবে এত অল্প দিনের মধ্যেই কথাটা ফলে

যাবে সেটা ভাবতে পারেননি। দেয়ালে তাঁরই তোলা চঞ্চুর ছবি টাঙানো রয়েছে; তুলসীবাবুরও কেমন জানি নিঝুম ভাব—সব মিলিয়ে প্রদ্যোতবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদি বন্ধুর মনে কিছুটা ফুর্তি আনা যায় তাই বললেন, 'অনেকদিন মনসুরে যাওয়া হয়নি মশাই। চলুন কাবাব খেয়ে আসি।'

'ওসবে আর রুচি নেই,' বললেন তুলসীবাবু।

প্রদ্যোতবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।—'সে কি মশাই, কাবাবে অরুচি? আপনার কি শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি? আপনার তো এতরকম ওষুধ জানা আছে—একটা কিছু খান!—সেই সাধু যে পাতার সন্ধান দিল, তাতে ফল হয় কিনা দেখেছেন?'

তুলসীবাবু জানালেন সেই পাতার রস খাবার পর থেকে তাঁর রক্তের চাপ একদম স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটা আর বললেন না যে যদ্দিন পাখি ছিল তদ্দিন চক্রপর্ণের গুণ পরীক্ষা করার কথা তাঁর মনেই আসেনি। এই সবে দিন দশেক হল তিনি আবার কবিরাজীতে মন দিয়েছেন।

'ভালো কথা,' বললেন প্রদ্যোতবাবু, 'চক্রপর্ণ বলতে মনে পড়ল—আজ কাগজে দণ্ডকারণ্যের খবরটা পড়েছেন?'

'কী খবর?'

তুলসীবাবু কাগজ রাখেন, কিন্তু সামনের পাতার বেশি আর এগোনো হয় না। কাগজটা হাতের কাছেই টেবিলের উপর ছিল। প্রদ্যোতবাবু খবরটা বার করে দিলেন। বেশ বড় হরফেই শিরোনামা রয়েছে—'দণ্ডকারণ্যের বিভীষিকা।'

খবরে বলছে গত দশ দিন ধরে দণ্ডকারণ্যের আশেপাশে অবস্থিত গ্রাম থেকে নানারকম গৃহপালিত পশু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি কোনো এক জানোয়ারের খাদ্যে পরিণত হতে শুরু করেছে। দণ্ডকারণ্যে বাঘের সংখ্যা কমই, আর এ যে বাঘের কীর্তি নয় তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাঘ খাদ্য টেনে নিয়ে যায়; এ জানোয়ার তা করে না। তাছাড়া আধ-খাওয়া গরু-বাছুর ইত্যাদি দেখে বাঘের কামড়ের সঙ্গে এ জানোয়ারের কামড়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। মধ্য প্রদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত দু'জন বাঘা শিকারী এক সপ্তাহ অনুসন্ধান করেও এমন কোনো জানোয়ারের সন্ধান পাননি যার পক্ষে এমন হিংস্র আচরণ সম্ভব। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একজন গ্রামবাসী দাবী করে সে নাকি একরাত্রে তার গোয়াল থেকে একটি দ্বিপদবিশিষ্ট জীবকে ঝড়ের বেগে পালাতে দেখেছে। তারপরই সে তার গোয়ালে গিয়ে তার মহিষকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। মহিষের তলপেটের বেশ খানিকটা অংশ নাকি খুবলে নেওয়া হয়েছিল।

তুলসীবাবু খবর পড়ে কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলের উপর রেখে

দিলেন।

'এটাও কি আপনার কাছে অবাক কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না?' প্রদ্যোতবাবু প্রশ্ন করলেন।

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তিনি বিস্মিত হননি।

এর তিনদিন পর প্রদ্যোতবাবুর জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

সকালে চায়ের কাপ এনে সামনে রাখলেন গিন্নী, সঙ্গে প্লেটে নতুন প্যাকেট থেকে বার করা তিনখানা ডাইজেসটিভ বিস্কুট। সেদিকে চোখ পড়তেই প্রদ্যোতবাবু হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আর তার পরেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

মিনিবাসে করে একডালিয়া রোডে তাঁর কলেজের বন্ধু অনিমেষের কাছে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর নাড়ী চঞ্চল।

বন্ধুর হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পাশে ফেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'তোর রীডার্স ডাইজেস্টগুলো কোথায় চট্ করে বল—বিশেষ দরকার।'

অন্য অনেকের মতোই অনিমেষ সরকারের প্রিয় পাঠ্য পুস্তক হল রীডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকা। বন্ধুর আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করারও সময় পেলেন না তিনি। উঠে গিয়ে বুকশেলফের তলার তাক থেকে এক গোছা পত্রিকা বার করলেন টেনে।

'কোন মাসেরটা চাচ্ছিস?'

ঝড়ের বেগে এ সংখ্যা ও সংখ্যা উলটে দেখে অবশেষে যা খুঁজছিলেন তা পেলেন প্রদ্যেতবাবু।

'এই চেহারা—এগজ্যাক্টলি!'

একটি পাখির ছবির উপর আঙুল রেখেছেন প্রদ্যোতবাবু। জ্যান্ত পাখি নয়। শিকাগো ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে রাখা একটি পাখির আনুমানিক মূর্তি। হাতে বুরুশ নিয়ে মূর্তিটাকে পরিষ্কার করছে মিউজিয়ামের এক কর্মচারী।

'অ্যাণ্ড্যালগ্যালর্নিস,' নামটা পড়ে বললেন প্রদ্যোতবাবু। 'অর্থাৎ টেরর বার্ড—ভয়াল পাখি। আয়তন বিশাল, মাংসাশী, ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী, আর অসম্ভব হিংস্র।'

প্রদ্যোতবাবুর মনে যে সন্দেহটা উঁকি দিয়েছিল সেটা সত্যি বলে প্রমাণ হল যখন পরদিন তুলসীবাবু আপিসে এসে বললেন যে তাঁকে আরেকবারটি দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, এবং তিনি খুব খুশি হবেন যদি প্রদ্যোতবাবু তাঁর সঙ্গে যান। হাতিয়ার সমেত। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া মুশকিল হতে পারে, কিন্তু তাতে পেছপা হলে চলবে না, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।

প্রদ্যোতবাবু রাজী হয়ে গেলেন।

অ্যাডভেঞ্চারের উৎসাহে দুই বন্ধু ট্রেনযাত্রার গ্লানি অনুভব করলেন না। প্রদ্যোৎবাবু যে রীডার্স ডাইজেস্টে পাখিটার কথা পড়েছেন সেটা আর বললেন না; সেটা বলার সময় ঢের আছে। তুলসীবাবু সবই বলে দিয়েছেন তাঁকে, আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহস্য করেছেন এটাও বলে যে পাখিকে মারার প্রয়োজন হবে বলে তিনি মনে করেন না, বন্দুক নিতে বলেছেন শুধু সাবধান হবার জন্য। প্রদ্যোতবাবু বন্ধুর কথায় কান দেননি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে এটা তিনি স্থির করে নিয়েছেন। গত রবিবারের কাগজে খবর বেরিয়েছে যে এই নৃশংস প্রাণীকে যে হত্যা করতে পারবে, মধ্য প্রদেশ সরকার তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। এই প্রাণী এখন নরখাদকের পর্যায়ে এসে পড়েছে; একটি কাঠুরের ছেলে সম্প্রতি তার শিকারে পরিণত হয়েছে।

জগদলপুরে পৌঁছে বনবিভাগের কর্তা মিঃ তিরুমালাইয়ের সঙ্গে কথা বলে শিকারের অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না। তবে তিরুমালাই সতর্ক করে দিলেন যে স্থানীয় কোনো লোককে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যাবে না। কোনো লোকই ওই বনের ত্রিসীমানায় যেতে রাজী হচ্ছে না।

প্রদ্যোতবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর যে-সব শিকারী আগে গেছে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা গেছে কি?'

তিরুমালাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ পর্যন্ত চারজন শিকারী প্রাণীটির সন্ধানে গিয়েছিল। প্রথম তিনজন বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। চতুর্থজন ফেরেনি।'

'ফেরেনি?'

'না। তারপর থেকে আর কেউ যেতে চাচ্ছে না। আপনারাও যাবেন কিনা সেটা ভালো করে ভেবে দেখুন।'

প্রদ্যোতবাবুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তুলসীবাবুর শান্ত ভাব দেখে তিনি জোর করে মনে সাহস ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, 'আমরা তাও যাব।'

এবারে হাঁটতে হল আরো বেশি, কারণ ট্যাক্সিওয়ালা মেন রোড ছেড়ে বনের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যেতে রাজী হল না। তুলসীবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে; পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দেওয়া হবে শুনে ট্যাক্সি সেই সময়টুকুরজন্য অপেক্ষা করতে রাজী হল। দুই বন্ধু গাড়ি থেকে নেমে বনের সেই বিশেষ অংশটির উদ্দেশে রওনা দিলেন।

বসন্তকাল, তাই বনের চেহারা বদলে গেছে, গাছপালা সবই ঋতুর নিয়ম মেনে চলছে। কচি সবুজে চারদিক ছেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে পাখির ডাক

একেবারেই নেই। কোয়েল দোয়েল পাপিয়া ইত্যাদি কবিদের একচেটিয়া বসন্তের পাখি সব গেল কোথায়?

তুলসীবাবুর কাঁধে এবারও তাঁর ঝোলা। তাতে একটি খবরের কাগজের মোড়ক রয়েছে সেটা প্রদ্যোতবাবু জানেন, যদিও তাতে কী আছে জানেন না। তুলসীবাবু ভোরে উঠে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন সেটা জিগ্যেস করা হয়নি। প্রদ্যোতবাবুর নিজের সঙ্গে রয়েছে তাঁর বন্দুক ও টোটা।

গতবারের তুলনায় আগাছা কম থাকাতে বনের মধ্যে দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে। তাই একটা দেবদারু গাছের পিছনে উপুড় হওয়া পা ছড়ানো মানুষের দেহটাকে বেশ দূর থেকেই দেখতে পেলেন প্রদ্যোতবাবু। তুলসীবাবু দেখেননি। প্রদ্যোতবাবু থেমে ইসারা করায় তাঁকেও থামতে হল।

প্রদ্যোতবাবু বন্দুকটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন দেহটার দিকে। তুলসীবাবুর ভাব দেখে মনে হল এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কৌতূহল নেই।

অর্ধেক পথ গিয়ে প্রদ্যোতবাবু ফিরে এলেন।

'আপনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে মশাই', বললেন তুলসীবাবু, 'এ তো সেই চতুর্থ শিকারী?'

'তাই হবে,' ধরা গলায় বললেন প্রদ্যোতবাবু, 'তবে লাশ সনাক্ত করা মুশকিল হবে। মুণ্ডুটাই নেই।'

বাকি পথটা দুজনে কেউই কথা বললেন না।

সেই নিম গাছটার কাছে পৌঁছাতে লাগল এক ঘন্টা, অর্থাৎ মাইল তিনেক হাঁটতে হয়েছে। প্রদ্যোতবাবু দেখলেন চক্রপর্ণের গাছটা ডালপাতা গজিয়ে আবার আগের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'চঞ্চু! চঞ্চু!'

প্রদ্যোতবাবুর এই সংকট মুহূর্তেও হাসি পেল। কিন্তু তার পরেই মনে হল তুলসীবাবুর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। এই রাক্ষুসে পাখি যে তাঁর পোষ মেনেছিল সেটা তো তিনি নিজেই দেখেছেন।

বনের পুবদিকে পাহাড় থেকে বার বার তুলসীবাবুর ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'চঞ্চু! চঞ্চু! চঞ্চু!'

মিনিট পাঁচেক ডাকার পর প্রদ্যোতবাবু দেখলেন যে বেশ দূরে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা কী যেন তাঁদেরই দিকে এগিয়ে আসছে, এবং এতই দ্রুত গতিতে যে তার আয়তন প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে।

এবার আর সন্দেহের কোনো কারণ নেই। ইনিই সেই ভয়াল পাখি।

প্রদ্যোতবাবু অনুভব করলেন তাঁর হাতের বন্দুকটা হঠাৎ যেন ভারী বলে মনে

হচ্ছে। প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করতে পারবেন কি ?

চঞ্চু গতি কমিয়ে একটা ঝোপ ভেদ করে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল।

অ্যাণ্ডালগ্যালর্নিস। নামটা মনে থাকবে প্রদ্যোতবাবুর। মানুষের সমান উঁচু পাখি। উটপাখিও লম্বা হয়, তবে সেটা প্রধানত তার গলার জন্য। এ পাখির পিঠই তুলসীবাবুর মাথা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ একমাসে পাখি উচ্চতায় বেড়েছে প্রায় দেড় ফুট। গায়ের রঙও বদলেছে। বেগুনীর উপর কালোর ছোপ ধরেছে। আর জলন্ত হলুদ চোখের ওই দৃষ্টি পাখির খাঁচাবন্দী অবস্থায় প্রদ্যোতবাবুর সহ্য করতে অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এখন সে-চোখের দিকে চাওয়া যায় না ; পাখির দৃষ্টি সটান তার প্রাক্তন মালিকের দিকে।

পাখি কী করবে জানা নেই। তার স্থির নিশ্চল ভাব আক্রমণের আগের অবস্থা

হতে পারে মনে করেই বোধ হয় প্রদ্যোতবাবুর কাঁপা হাতে ধরা বন্দুকটা খানিকটা উঁচিয়ে উঠেছিল। ওঠামাত্র পাখির দৃষ্টি বন্দুকের দিকে ঘুরল আর তার পরমুহূর্তেই প্রদ্যোতবাবু শিউরে উঠলেন দেখে যে পাখির গায়ের প্রত্যেকটি পালক উঁচিয়ে উঠে তার আকৃতি আরো শতগুণে ভয়াবহ করে তুলেছে।

'ওটা নামিয়ে ফেলুন,' চাপা ধমকের সুরে বললেন তুলসীবাবু।

প্রদ্যোতবাবুর হাত নেমে এল, আর সেই সঙ্গে পাখির পালকও নেমে এল। তার দৃষ্টিও আবার ঘুরে গেল তুলসীবাবুর দিকে।

'তোর পেটে জায়গা আছে কিনা জানি না, তবে আমি দিচ্ছি বলে যদি খাস।'

তুলসীবাবু ঝোলা থেকে ঠোঙাটা আগেই বার করেছিলেন, এবার তাতে একটা ঝাঁকুনি দেওয়াতে একটি বেশ বড় মাংসের খণ্ড ছিট্‌কে বেরিয়ে পাখিটার সামনে গিয়ে পড়ল।

'অনেক লজ্জা দিয়েছিস আমাকে, আর দিসনি।'

প্রদ্যোতবাবু অবাক হয়ে দেখলেন যে পাখিটা ঘাড় নিচু করে ঠোঁট দিয়ে মাটি থেকে মাংসখণ্ড তুলে নিয়ে তার মুখে পুরল।

'এবার সত্যিই গুডবাই।'

তুলসীবাবু ঘুরলেন। প্রদ্যোতবাবু চট্ করে পাখির দিকে পিঠ করার সাহস না পেয়ে কিছুক্ষণ পিছু হাঁটলেন। তারপর পাখি এগোচ্ছে না বা আক্রমণ করার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না দেখে ঘুরে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা শুরু করলেন।

দণ্ডকারণ্যের রাক্ষুসে প্রাণীর অত্যাচার রহস্যজনকভাবে থেমে যাবার খবর কাগজে বেরোল দিন সাতেক পরে। পাছে বিস্ময় প্রকাশ না করে রসভঙ্গ করেন, তাই প্রদ্যোতবাবু অ্যাণ্ডালগ্যালর্নিসের কথা, বা সে পাখি যে আজ ত্রিশ লক্ষ বছর হল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে কথা কিছুই বলেননি তুলসীবাবুকে। আজ খবরটা পড়ে আপিসে এসে তাঁকে আসতেই হল তাঁর বন্ধুর কাছে। বললেন, 'আমার মন বলছে আপনি এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন। আমি তো মশাই অথৈ জলে।'

'ব্যাপারটা কিছুই না,' কাজ বন্ধ না করেই বললেন তুলসীবাবু, 'মাংসের সঙ্গে ওষুধ মেশানো ছিল।'

'ওষুধ ?'

'চক্রপর্ণের রস,' বললেন তুলসীবাবু, 'আমিষ ছাড়ায়। যেমন আমাকে ছাড়িয়েছে।'

লখ্নৌর ডুয়েল

'ডুয়েল মানে জানিস ?' জিগ্যেস করলেন তারিণীখুড়ো।

'বাঃ, ডুয়েল জানব না ?' বলল ন্যাপলা। 'ডুয়েল রোল, মানে দ্বৈত ভূমিকা। সন্তোষ দত্ত গুপী গাইনে ডুয়েল রোল করেছিলেন—হাল্লার রাজা, শুণ্ডীর রাজা।'

'সে ডুয়েলের কথা বলছি না,' হেসে বললেন তারিণীখুড়ো। 'ডি-ইউ-এ-এল নয়, ডি-ইউ-ই-এল ডুয়েল। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে লড়াই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি জানি !' আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

'এই ডুয়েল নিয়ে এককালে কিছু পড়াশুনা করেছিলুম নিজের শখে,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালি থেকে ডুয়েলিং-এর রেয়াজ ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তরোয়াল জিনিসটা ছিল ভদ্রলোকদের পোশাকের একটা অঙ্গ, আর অসি-চালনা বা ফেনসিং শেখাটা পড়ত সাধারণ শিক্ষার মধ্যে। একজন হয়ত অরেকজনকে অপমান করল, অমনি অপমানিত ব্যক্তি ইজ্জত বাঁচাবার খাতিরে অন্যজনকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করল ; এই চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করাটা রেয়াজের মধ্যে পড়ত না, ফলে সোর্ড ফাইট শুরু হয়ে যেতো। মান যে বাঁচবেই এমন কোনো কথা নেই, কারণ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি অসি চালনায় তেমন নিপুণ নাও হতে পারেন। কিন্তু তাও চ্যালেঞ্জ করা চাই, কারণ অপমান হজম করাটা সেকালে অত্যন্ত হেয় বলে গণ্য হত।

'বন্দুক-পিস্তলের যুগে অবিশ্যি পিস্তলই হয়ে গেল ডুয়েলিং-এর অস্ত্র। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই ডুয়েলিং-এ তখন এত লোক মরত আর জখম হত, যে এটাকে বেআইনী করার চেষ্টা ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এক রাজা আইন করে বন্ধ করলেন তোপরের রাজা ঢিলে দেওয়াতে আবার চালু হয়ে গেল ডুয়েলিং। আর কতরকম তার আইনকানুন !—দুজনকেই হুবহু একরকম অস্ত্র

ব্যবহার করতে হবে, দুজনেরই একটি করে "সেকেন্ড" বা আম্পায়ার থাকবে যাতে কারচুপির রাস্তা বন্ধ হয় ; দুজনকেই দাঁড়াতে হবে এমন জায়গায় যাতে পরস্পরের মধ্যে আন্দাজ বিশ গজের ব্যবধান থাকে, আর চ্যালেঞ্জারের সেকেন্ড "ফায়ার" বলা মাত্র দুজনের একসঙ্গে গুলি চালাতে হবে। তোরা জানিস কিনা জানি না, এই ভারতবর্ষেই—না, ভারতবর্ষ কেন—এই কলকাতাতেই, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক বিখ্যাত ডুয়েল লড়াই হয়েছিল ?'

ন্যাপলাও দেখলাম জানে না ; সেও আমাদের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'যে দুজন লড়েছিলেন,' বললেন তারিণীখুড়ো, 'তাঁদের একজন তো জগদ্বিখ্যাত। তিনি হলেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রতিপক্ষের নাম ফিলিপ ফ্রানসিস। ইনি ছিলেন বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য। হেস্টিংস কোনো কারণে ফ্রানসিসকে একটি অপমানসূচক চিঠি লেখেন। ফ্রানসিস তখন তাঁকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করেন। আলিপুরে এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারই কাছে একটা খোলা জায়গায় এই ডুয়েল হয়। ফ্রানসিস চ্যালেঞ্জ করেছেন, ফলে তাঁরই এক বন্ধুকে জোড়া-পিস্তল জোগাড় করতে হল, এবং তিনিই "ফায়ার" বলে চেঁচালেন। পিস্তলও চলেছিল একই সঙ্গে, কিন্তু মাটিতে জখম হয়ে পড়ল মাত্র একজনই—ফিলিপ ফ্রানসিস। তবে সুখের বিষয় সে-জখম মারাত্মক হয়নি।'

'ইতিহাস তো হল,' বলল ন্যাপলা, 'এবার গল্প হোক্। ডুয়েলিং যখন আপনার মাথায় ঘুরছে, তখন মনে হচ্ছে ডুয়েল নিয়ে নির্ঘাত আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে।'

খুড়ো বললেন, 'তোরা যা ভাবছিস সেরকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও, যা আছে শুনলে তাক্ লেগে যাবে।'

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিয়ে, পকেট থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বার করে পাশে তক্তপোশের ওপর রেখে তারিণীখুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন—

'আমি থাকি তখন লখ্নৌতে। রেগুলার চাকরি বলে কিছু নেই, এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই, কারণ তার বছর দেড়েক আগে রেঞ্জার্সের লটারিতে লাখ দেড়েক টাকা পেয়ে, তার সুদেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমি বলছি ফিফ্‌টি ওয়ানের কথা। তখনও আর এমন মাগ্যির বাজার ছিল না, আমি একা মানুষ, মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা হলে দিব্যি আরামে চলে যেত। লাটুশ রোডে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়ি নিয়ে থাকি, 'পায়োনীয়ার' কাগজে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে চুট্‌কি গোছের লেখা লিখি, আর হজরতগঞ্জের একটা নিলামের দোকানে যাতায়াত করি। নবাবদের আমলের কিছু কিছু জিনিস তখনও পাওয়া যেত। সুবিধের দামে পেলে ধনী আমেরিকান টুরিস্টদের কাছে বেচে বেশ টুপাইস লাভ করা যেত।

অবিশ্যি আমার নিজেরও যে শখ ছিল না তা নয়। আমার বৈঠকখানা ছোট হলেও তার অনেক জিনিসই ছিল এই নিলামের দোকানে কেনা।

এক রবিবার সকালে দোকানে গিয়ে দেখি জিনিসপত্তরের মধ্যে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের মেহগানি কাঠের বাক্স, এক হাত লম্বা, এক বিঘত চওড়া, ইঞ্চি তিনেক পুরু। ভেতরে কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারলাম না, তাই জিনিসটা সম্বন্ধে কৌতূহল গেল বেড়ে। নিলামে অনেক জিনিস উঠেছে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে ওই বাক্সের দিকে।

অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দেখলুম নিলামদার বাক্সটাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। আমি টান হয়ে বসলুম। যথারীতি গুণকীর্তন শুরু হল।—'এবারে একটি অতি লোভনীয় জিনিস আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। এর জুড়ি পাওয়া ভার। দেখুন, এই যে ঢাকনা খুলছি আমি। দুশো বছরের পুরানো জিনিস, অথচ এখনো এর জেল্লা অম্লান রয়েছে। জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক জোসেফ ম্যান্টনের ছাপমারা এক জোড়া ডুয়েলিং পিস্তল। এই জোড়ার আর জুড়ি নেই!...'

আমার তো দূর থেকে দেখেই হয়ে গেছে। ও জিনিসটা আমার চাই। আমার কল্পনা তখনই খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিশ হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ফায়ার !' শোনামাত্র গুলি চালাচ্ছে, আর তার পরেই রক্তাক্ত ব্যাপার !

এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছে, নিলামও হয়ে চলেছে, চারবাগের এক গুজরাটি ভদ্রলোক সাড়ে সাত শো বলার পর আমি ধাঁ করে হাজার বলাতে দেখলাম ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে গেল, ফলে বাক্স সমেত পিস্তল দুটি আমারই হয়ে গেল।

জিনিসটা দোকানে দেখে যতটা ভালো লেগেছিল, বাড়িতে এসে হাতে নিয়ে তার চেয়ে যেন শতগুণে বেশি ভালো লাগল। পিস্তলের মতো পিস্তল বটে। যেমন তার বাঁট, তেমনি তার নল। পুরো পিস্তল প্রায় সতেরো ইঞ্চি লম্বা। তার গায়ে পরিষ্কার খোদাই করা রয়েছে মেকারের নাম—জোসেফ ম্যান্টন ! বন্দুক সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা আগেই করা ছিল ; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলন্ডে বন্দুক বানিয়ে হিসেবে যাদের সবচেয়ে বেশি নামডাক ছিল, তার মধ্যে জোসেফ ম্যান্টন হলেন একজন।

লখ্নৌ গিয়েছি সবে মাস তিনেক হল। ওখানে বাঙালীর সংখ্যা বিশেষ কম নয়, কিন্তু তখনো পর্যন্ত কারুর সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। সন্ধ্যাবেলাটা মোটামুটি বাড়িতেই থাকি ; আমি ছাড়া থাকে একজন রান্নার লোক আর একটি চাকর। পিস্তল দুটো কেনা অবধি ডুয়েলিং সংক্রান্ত একটা প্লট ঘুরছে, তাই খাতা-কলম নিয়ে আরাম কেদারায় বসেছি, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া

নাড়ল। কোনো বিদেশী খদ্দের নাকি? পুরানো জিনিসের সাপ্লায়ার হিসেবে আমার কিছুটা পরিচিতি এর মধ্যেই হয়ে গেছে।

গিয়ে দরজা খুললুম। একজন সাহেবই বটে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বোঝাই যায় এদেশে অনেকদিনের বাসিন্দা, এমনকি জন্মও হয় এখানেই। অর্থাৎ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

'গুড ইভিনিং।'

আমিও প্রত্যাভিবাদন জানালুম। সাহেব বলল, 'একটু দরকার ছিল। ভেতরে বসতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

সাহেবের উচ্চারণে কিন্তু দোআঁশলা ভাব নেই একদম।

ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় এনে বসালাম। এইবার আলোয় চেহারাটা আরো স্পষ্ট বোঝা গেল। সুপুরুষই বলা চলে। চুল কটা। একজোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ তাও কটা, চোখের মণি নীল, পরনে ছাই রঙের সুট। আমি বললুম, 'সাহেব, আমিতো মদ খাই না, তবে যদি বলো তোএক পেয়ালা চা বা কফি করে দিতে পারি।' সাহেব বললে যে তার কিছুরই দরকার নেই, সে এইমাত্র বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে আসছে। তারপর তার আসার কারণটা বললে।

'তোমায় আজ সকালে দেখলাম হজরতগঞ্জের অকশন হাউসে।'

'তুমিও ছিলে বুঝি সেখানে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু তুমি এত তন্ময় ছিলে তাই বোধহয় খেয়াল করনি।'

'আসলে একটা জিনিসের ওপর খুব লোভ ছিল—'

'সেটা তো তোমারই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ডুয়েলিং পিস্তল—জোসেফ ম্যান্টনের তৈরি! ইউ আর ভেরি লাকি!'

আমি একটা কথা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'ওটা কি তোমার কোনো চেনা লোকের সম্পত্তি ছিল?'

'হ্যাঁ, তবে সে বহুদিন হল মারা গেছে। তারপর কোথায় চলে গিয়েছিল জিনিসটা জানতাম না। ওটা কি আমি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি? কারণ ওটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত রয়েছে, তাই...'

আমি সাহেবের হাতে পিস্তলের বাক্সটা দিলুম। সাহেব সেটা খুলে পিস্তলটা বার করে উদ্ভাসিত চোখে সেটা ল্যাম্পের কাছে নিয়ে গিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে, 'এই পিস্তল দিয়ে এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল এই লখ্নৌ শহরে সেটা বোধহয় তুমি জান না?'

'লখ্নৌতে ডুয়েল!'

'হ্যাঁ। আজ থেকে দেড়শো বছর আগের ঘটনা। একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর

শেষে। সত্যি বলতে কী, আর তিন দিন পরেই ঠিক দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। ষোলই অক্টোবর।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'খুব আশ্চর্য তো! কিন্তু ডুয়েলটা কাদের মধ্যে হয়েছিল—'?

সাহেব পিস্তলটা ফেরত দিয়ে আবার সোফায় বসে বললে, 'সমস্ত ঘটনাটা আমার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শোনা যে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই।...ডাঃ জেরিমায়া হাডসনের মেয়ে অ্যানাবেলা হাডসন তখন ছিল লখ্নৌ-এর নামকরা সুন্দরী। ডাকসাইটে তরুণী; ঘোড়া চালায়, বন্দুক চালায়—দুটোই পুরুষের মতো। এদিকে আবার ভালো নাচতে পারে, গাইতে পারে। সেই সময় লখ্নৌতে এক তরুণ ইংরেজ আর্টিস্ট এসে রয়েছেন, নাম জন ইলিংওয়ার্থ। তার আসল মতলব নবাবের ছবি এঁকে ভালো ইনাম পাওয়া, কিন্তু অ্যানাবেলার সৌন্দর্যের কথা শুনে আগে তার একটা পোর্ট্রেট করার প্রস্তাব নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। ছবিও হল বটে, কিন্তু তার আগেই ইলিংওয়ার্থ অ্যানাবেলাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছে।

'এদিকে তারই কিছুদিন আগে একটা পার্টিতে অ্যানাবেলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে চার্লস ব্রুসের। লখ্নৌ ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা বড় অংশ ছিল, তারই ক্যাপ্টেন ছিলেন চার্লস ব্রুস। ব্রুসও প্রথম দর্শনেই অ্যানাবেলার প্রেমে পড়ে গেলেন।

'পার্টির দুদিন বাদে আর থাকতে না পেরে অ্যানাবেলার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন ব্রুস। গিয়ে দেখেন একটি অচেনা তরুণ অ্যানাবেলার ছবি আঁকছে। ইলিংওয়ার্থ তেমন জোয়ান পুরুষ না হলেও চেহারাটা তার মন্দ ছিল না। তার হাবভাবে সেও যে অ্যানাবেলার প্রতি অনুরক্ত এটা বুঝতে ব্রুসের দেরি লাগল না। শিল্পী জাতটাকে ব্রুস এমনিতেই অবজ্ঞা করে, বর্তমান ক্ষেত্রে সে অ্যানাবেলার সামনেই ইলিংওয়ার্থকে একটা অপমানসূচক কথা বলে বসল।

'ইলিংওয়ার্থের মধ্যে যা গুণ ছিল তা সবই শিল্পীসুলভ গুণ, আর তার প্রবৃত্তিগুলি ছিল কোমল। কিন্তু আজ অ্যানাবেলার সামনে এই অপমান সে হজম করতে পারল না। সে ব্রুসকে ডুয়েলের চ্যালেঞ্জ করে বসল। ব্রুসও খুশি মনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। ডুয়েলের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল—ষোলই অক্টোবর, ভোর ছটা।

'তুমি জান বোধহয় যে যারা ডুয়েল লড়বে তাদের একজন করে সেকেন্ডের দরকার হয়?'

আমি বললাম, 'জানি। এরা আম্পায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ লক্ষ রাখে যে

ডুয়েলের নিয়মগুলো ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা।'

'হ্যাঁ। সচরাচর এই সেকেণ্ডটি হয় যে ডুয়েল লড়বে তার বন্ধুস্থানীয় কেউ। লখনৌ শহরে ইলিংওয়ার্থের পরিচিতদের সংখ্যা বেশি না হলেও, সরকারী দপ্তরের এক কর্মচারীর সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়েছিল। এঁর নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থ ড্রামন্ডকে অনুরোধ করল এক জোড়া ভালো পিস্তল জোগাড় করে দিতে, কারণ ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী দুটো পিস্তল ঠিক একরকম হওয়া চাই। এ ছাড়া ইলিংওয়ার্থের দ্বিতীয় অনুরোধ হল ড্রামন্ড যেন তার সেকেন্ডের কাজ করে। ড্রামন্ড রাজি হল। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ব্রুসও তাঁর বন্ধু ফিলিপ মক্সনকে তাঁর সেকেন্ড করলেন।

'ডুয়েলের দিন এগিয়ে এল। এর ফলাফল যে কী হবে সে সম্বন্ধে কারুর মনে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ পিস্তলে ক্যাপ্টেন ব্রুসের লক্ষ্য অব্যর্থ, আর ইলিংওয়ার্থ তুলি চালনায় নিপুণ হলেও পিস্তল চালনায় একেবারেই অপটু।'

এই পর্যন্ত বলে সাহেব থামলেন। আমি ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করলুম, 'শেষ পর্যন্ত কী হল ?'

সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'প্রতি বছর ষোলই অক্টোবর ভোর ছটায় কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।'

'কোথায় ?'

'ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে। দিলখুশার পশ্চিমে গুমতী নদীর কাছে একটা মাঠে তেঁতুল গাছের নিচে।'

'পুনরাবৃত্তি মানে ?'

'যা বলছি তাই। ওখানে তরশু ভোর ছটায় গেলে পুরো ঘটনাই চোখের সামনে ঘটতে দেখবে।'

'বলছ কী ! এ তো ভৌতিক ব্যাপার !'

'আমার কথা মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি নিজেই গিয়ে যাচাই করে এসো তিন দিন পরে।'

'কিন্তু আমি কি জায়গাটা ঠিক চিনে যেতে পারব ? আমি তো বেশিদিন হল এখানে আসিনি। লখ্নৌ-এর ভূগোলটা এখনো—'

'তুমি দিলখুশা চেনো তো ?'

'তা চিনি।'

'দিলখুশার বাইরে আমি পৌনে ছটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'বেশ। তাই কথা রইল।'

সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপরই খেয়াল হল যে ভদ্রলোকের নামটাই জানা হয়নি। অবিশ্যি উনিও আমার নাম জিগ্যেস করেননি। যাই হোক,

নামটা বড় কথা নয় ; যে কথাগুলো উনি বলে গেলেন সেগুলোই হল আসল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই শহরেই এককালে এরকম রোমান্টিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, এবং আমারই হাতে রয়েছে এক জোড়া পিস্তল যেগুলো এই ঘটনায় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে জুটল অ্যানাবেলা হাডসন ? এবং আরো একটা প্রশ্ন—এই দুজনের মধ্যে কাকে ভালোবেসেছিল অ্যানাবেলা ?

আশা করি ষোল তারিখের অভিযানেই এইসব প্রশ্নের জবাব মিলবে।

ক্রমে এগিয়ে এল ষোলোই অক্টোবর। পনেরোই রাত্তিরে একটা গানের জলসা থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় দেখা সেই সাহেবের সঙ্গে। বলল, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য।' আমি বললাম, 'আমি যে শুধু ভুলিনি তা নয়, অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আগামীকাল সকালের জন্য অপেক্ষা করে আছি।' সাহেব চলে গেল।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর পাঁচটায় উঠে এক কাপ চা খেয়ে গলায় একটা মাফ্‌লার চাপিয়ে নিয়ে একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম দিলখুশার উদ্দেশে। শহরের একটু বাইরে দিলখুশা এককালে ছিল নবাব সাদাত আলির বাগান বাড়ি। চারিদিকে ঘেরা প্রকাণ্ড পার্কে হরিণ চরে বেড়াত। কখনো-সখনো জঙ্গল থেকে এক-আধটা চিতাবাঘও নাকি এসে পড়ত বাড়ির ত্রিসীমানায়। এখন সে বাড়ির শুধুই খোলটাই রয়েছে। তবে তার পাশে একটা ফুলবাগিচা এখনো মেনটেন করা হয়, লোকে সেখানে বেড়াতে যায়।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, 'তুমি যদি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কর, তাহলে আমি আবার এই গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারি।' উর্দুটা ভালো জানা ছিল আগেই, তাই বোধহয় খানদানী আদমি ভেবে টাঙ্গাওয়ালা রাজি হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই একটা অর্জুন গাছের পাশে দেখি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন তিনিও নাকি মিনিট পাঁচেক হল এসেছেন।

'লেট্‌স গো দেন।'

বললুম, 'চলো সাহেব—তুমিই তো পথ জান, তোমার পিছু নেব আমি।'

মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই একটা খোলা মাঠে এসে পড়লুম। দূরে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ চারিদিক একটা আবছা কুয়াশায় ঢাকা। হয়ত ডুয়েলের দিনেও ঠিক এমনি কুয়াশা ছিল !

আগাছা আর কাঁটা ঝোপে ঘেরা একটা পোড়ো বাড়ির কাছে এসে সাহেব থামল। দেখেই বোঝা যায় সেটা প্রাচীনকালে কোনো সাহেবের বাড়ি ছিল।

অবিশ্যি আমাদের কারবার এই বাড়িটাকে নিয়ে নয়। সেটাকে পিছনে ফেলে আমরা দাঁড়ালাম পূব দিকে মুখ করে। কুয়াশা হলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনে কিছু দূরে রয়েছে একটা তেঁতুল গাছ, আর তার ডাইনে আমাদের থেকে হাত চল্লিশেক দূরে রয়েছে একটা বেশ বড় ঝোপ। আর সব কিছুর পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে গুমতী নদী। নদীর পিছনে কুয়াশা হলেও, আন্দাজ করা যায় ওদিকটায় বসতি নেই। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

'শুনতে পাচ্ছ?' সাহেব হঠাৎ জিগ্যেস করলেন।

কান পাততেই শুনতে পেলুম। ঘোড়ার খুরের শব্দ। গাটা যে ছমছম করছিল না তা বলতে পারি না। তবে তার সঙ্গে একটা অভিনব অভিজ্ঞতার চরম প্রত্যাশা।

এইবার দেখলুম দুই অশ্বারোহীকে। আমাদের বাঁ দিকে বেশ দূর দিয়ে এসে তেঁতুল গাছটার নিচে দাঁড়াল।

'এরা দুজনেই কি লড়বেন?' আমি ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলুম।

সাহেব বললেন, দুজন নয়, একজন। দুজনের মধ্যে লম্বাটি হল জন ইলিংওয়ার্থ, অর্থাৎ যে চ্যালেঞ্জ করেছে। অন্যজন ইলিংওয়ার্থের সেকেন্ড ও বন্ধু, হিউ ড্রামন্ড। ওই দেখ ড্রামন্ডের হাতে সেই মেহগানি বাক্স।

সত্যিই তো! এবার বুঝলুম আমার রক্ত চলাচল দ্রুত হতে শুরু করেছে। আমি যে দেড়শ বছর আগের একটি ঘটনা আজ ১৯৫০ সালে লখ্নৌ শহরে দাঁড়িয়ে দেখতে চলেছি, সেই চিন্তা আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়ায় ক্যাপ্টেন ব্রুস ও তাঁর সেকেন্ড ফিলিপ মক্সন এসে পড়লেন। তারপর ড্রামন্ড বাক্স থেকে পিস্তল দুটো বার করে তাতে গুলি ভরে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থের হাতে দিয়ে তাদের যেন কি সব বুঝিয়ে দিলেন।

পিছনের আকাশ গোলাপী হতে শুরু করেছে, গুমতীর জলে সেই রং প্রতিফলিত।

ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ এবার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দুজনেই গুনে গুনে চোদ্দ পা হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো শব্দ শুনতে পাইনি, কিন্তু এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল উঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তাক করার পর স্পষ্ট কানে এল ড্রামন্ডের আদেশ—

'ফায়ার!'

পরমুহূর্তেই শুনলাম এক সঙ্গে দুই পিস্তলের গর্জন।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ দুজনের দেহই একসঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্গে আরেকটি দৃশ্য আমাকে আরো অবাক করে দিল। যে ঝোপটার কথা বলছিলাম, সেটার পিছন থেকে এক মহিলা ছুটে বেরিয়ে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ফলাফল তো দেখলে,' বললেন সাহেব, এই ডুয়েলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল।'

বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু ঝোপের পিছন থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে চলে গেলেন, তিনি কে?'

'দ্যাট ওয়াজ অ্যানাবেলা।'

'অ্যানাবেলা!'

'ইলিংওয়ার্থের গুলিতে ক্যাপ্টেন ব্রুস মরবে না এটা অ্যানাবেলা বুঝেছিল—অথচ ওর দরকার ছিল যাতে দুজনেই মরে। তাই সে আর ঝুঁকি না নিয়ে "ফায়ার" বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পিস্তল দিয়ে ব্রুসকে মারে। ইলিংওয়ার্থের গুলি ব্রুসের গায়ে লাগেইনি।'

'কিন্তু অ্যানাবেলার এই আচরণের কারণ কী?'

'কারণ সে ওই দুজনের একজনকেও ভালোবাসেনি। ও বুঝেছিল, ইলিংওয়ার্থ মরবে, এবং ব্রুস বেঁচে থেকে ওকে বিরক্ত করবে। সেটা ও চায়নি, কারণ সে আসলে ভালোবাসত আরেকজনকে—যাকে সে পরে বিয়ে করে এবং যার সঙ্গে সে সুখে ঘর করে।'

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে দেড়শ বছরের পুরানো ডুয়েলের দৃশ্য দ্রুত মিলিয়ে আসছে। কুয়াশাও যেন আরো ঘন হচ্ছে। আমি আশ্চর্য মহিলা অ্যানাবেলার কথা ভাবছি, এমন সময় একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

'হিউ! হিউ!'

'অ্যানাবেলা ডাকছে,' বললেন সাহেব।

আমার দৃষ্টি এবার সাহেবের দিকে ঘুরতেই শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরন খেলে গেল। এ কাকে দেখছি চোখের সামনে? এর পোশাক বদলে গেল কী করে?—এ যে সেই দেড়শ বছর আগের পোশাক!

'তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি,' বলে৲ন সাহেব; তাঁর গলার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।—'আমার নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থের বন্ধুকেই ভালোবাসত অ্যানাবেলা। গুড বাই...'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলাম সাহেব ওই পোড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টাঙ্গা করে বাড়ি ফিরে মেহগানির বাক্সটা খুলে পিস্তলদুটো আরেকবার বার করলাম। নলে হাত পড়তে গরম লাগল। এবার নলের মুখটা নাকের কাছে আনলাম। টাটকা বারুদের গন্ধ।

তারিণীখুড়ো ও বেতাল

শ্রাবণ মাস, দিনটা ঘোলাটে, সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে সন্ধের দিকে তারিণীখুড়ো এসে হাজির। হাতের ভিজে জাপানী ছাতাটা সড়াৎ করে বন্ধ করে দরজার পাশটায় দাঁড় করিয়ে রেখে তক্তপোশে তাঁর জায়গাটায় বসে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে খুড়ো বললেন, 'কই, আর সবাইকে ডাক, আর নিকুঞ্জকে বল নতুন করে জল ফুটিয়ে এক কাপ চা করতে।'

লোড শেডিং, তাই বসবার ঘরে দুটো মোমবাতি জ্বলছে, তাতে থমথমে ভাবটা তো কমেইনি, বরং বেড়েছে।

নিকুঞ্জই জল চাপিয়ে পাড়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ন্যাপ্‌লা, ভুলু, চটপটি আর সুনন্দকে ডেকে আনল। ন্যাপ্‌লা এসেই বলল, 'এই বাদলা দিনে মোমবাতির আলোয় কিন্তু—'

'ভূতের গল্প তো?'

'মানে, যদি আপনার স্টকে আর থাকে। দুটো গল্প তো অলরেডি বলা হয়ে গেছে।'

'আমার স্টক? আমার যা স্টক তাতে দুটো আরব্যোপন্যাস হয়ে যায়।'

'তার মানে টু থাউজ্যান্ড অ্যান্ড টু নাইটস্?'

আমাদের মধ্যে ন্যাপ্‌লাই খুড়োর সঙ্গে তাল রেখে কথা বলতে পারে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন খুড়ো। 'তবে সব যে ভূতের গল্প তা নয় অবশ্যই।'

এখানে বলে রাখি যে তারিণীখুড়োর গল্পগুলো এত জমাটি হয় যে সেগুলো গুল না সত্যি সে কথাটা আর কোনোদিন জিগ্যেস করি না। তবে এটা জানি যে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘোরার ফলে খুড়োর অভিজ্ঞতার স্টক অফুরন্ত।

'আজকে কিসের গল্প বলবেন?' জিগ্যেস করল ভুলু।

'আজকেরটা ভূতেরও বলতে পারিস, কঙ্কালেরও বলতে পারিস।'

'কঙ্কাল আর ভূত যে এক জিনিস সেটা তো জানতাম না,' বলল ন্যাপলা।

'তুই আর কী জানিস রে ছোকরা ? এক জিনিস না হলেও একেক সময় এক হয়ে যায়। অন্তত আমি যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি তাতে তাই হয়েছিল। শোনার যদি সাহস থাকে তোদের তো বলতে পারি।'

আমরা পাঁচজন একসঙ্গে পর পর তিনবার 'আছে !' বলার পর খুড়ো শুরু করলেন।

আমি তখন মালাবারে এলাচের ব্যবসা করে বেশ দু' পয়সা কামিয়ে আবার ভবঘুরে। কোচিন থেকে গেলুম কোয়েম্বাটোর, সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর টু কুর্নুল, কুর্নুল টু হায়দ্রাবাদ। ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া ট্রেনে চড়ি না, ভালো হোটেলে থাকি, শহরে ঘোরার ইচ্ছে হলে ট্যাক্সি ডাকি। হায়দ্রাবাদে যাবার ইচ্ছে ছিল সালার জাং মিউজিয়মটা দেখার জন্য। স্রেফ একজন লোকের সংগ্রহ থেকে একটা পুরো মিউজিয়ম হয়ে যায় সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মিউজিয়ম দেখে গোলকোণ্ডায় একটা ট্রিপ মেরে আবার বেরিয়ে পড়ব ভাবছি, এমন সময় লোকাল কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে মনটা চনমন করে উঠল। হায়দ্রাবাদেরই আর্টিস্ট ধনরাজ মার্তন্ড একজন মডেল চাইছেন পৌরাণিক ছবি আঁকার জন্য। তোরা রবিবর্মার নাম শুনেছিস কিনা জানি না। রাজা রবিবর্মা। ট্র্যাভাঙ্কোরের এক রাজবংশের ছেলে ছিলেন। পৌরাণিক ছবি এঁকে খুব নাম করেছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিকটায়। ভারতবর্ষের বহু রাজারাজড়ার বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর আঁকা সব অয়েল পেন্টিং। কতকটা রবিবর্মার স্টাইলের ছবি আঁকে এই ধনরাজ মার্তন্ড, আর আমি যখনকার কথা বলছি, বছর পঁয়ত্রিশ আগে, তখন লোকটার খুব নাম, খুব পসার। তার এই বিজ্ঞাপনটা দেখে বেশ একটা জোরালো প্রতিক্রিয়া হল। পুরুষ মডেল চেয়েছে, চেহারা ভালো হওয়া চাই, রোজ সিটিং দিতে হবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে। তোদের তো বলেইছি, সে বয়েসে আমার চেহারা ছিল লাইক এ প্রিন্স। তার উপর ডন-বৈঠক দেওয়া শরীর। গায়ে জোব্বা, মাথার মুকুট আর কোমরে তলোয়ার দিয়ে যে-কোনো নেটিভ স্টেটের সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়। যাই হোক, অ্যাপ্লাই করে দিলুম, আর ডাকও এসে গেল সাতদিনের মধ্যে।

নতুন খুরে দাড়ি কামিয়ে ভালো পোশাক পরে দুর্গা বলে হাজির হলুম মার্তন্ডের অ্যাড্রেসে। বাড়িটা দেখেই মনে হল এককালে কোনো নবাবের হাভেলি-টাভেলি ছিল। চারিদিকে মার্বেল মোজেইক নকশার ছড়াছড়ি। পৌরাণিক ছবিতে যে ভালো রোজগার হয় সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

উর্দিপরা বেয়ারা এসে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা সারি সারি চেয়ার পাতা ঘরে। সেখানে জনা পাঁচেক ক্যানডিডেট অপেক্ষা করছে, যেন ডাক্তারের ওয়েটিং রুম। এদের মধ্যে একজনের চেহারাটা চেনা চেনা লাগলেও সে যে কে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি বসার মিনিট খানেকের মধ্যেই সে লোকের ডাক এল। বেয়ারা ঘরে ঢুকে 'বিশ্বনাথ সোলাঙ্কি' বলতেই চিনে ফেললুম লোকটাকে। ফিল্ম পত্রিকায় এঁর ছবি দেখেছি। কিন্তু তাহলে আবার চাকরির জন্য দরখাস্ত করা কেন ?

কৌতূহল হওয়াতে আমার পাশে বসা ভদ্রলোকটিকে জিগ্যেস করলুম, 'আচ্ছা, যিনি এক্ষুনি উঠে গেলেন, তিনি বোধহয় একজন ফিল্মস্টার, তাই না ?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'স্টার হলে কি আর এখানে দেখতে পেতে ? হতে চেয়েছিল স্টার, কিন্তু তিনটি ছবি পর পর মার খাওয়াতে এখন অন্য রাস্তা দেখছে।'

ভদ্রলোক আরো বললেন যে সোলাঙ্কি নাকি হায়দ্রাবাদেরই ছেলে। ধনী বাপের পয়সা উড়িয়েছে জুয়া খেলে আর ফুর্তি করে। তারপর বোম্বাই গিয়ে ফিল্মের হিরো হবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার এখানে ফিরে এসেছে।

যিনি এসব খবর দিলেন তিনি নিজেও অবিশ্যি একজন ক্যানডিডেট। পাঁচজনের সকলেই মডেল হবার আশায় এসেছেন, তবে তার মধ্যে সোলাঙ্কির চেহারাটাই মোটের উপর ভালো, যদিও যাকে পৌরুষ বলে সে জিনিসটার একটু অভাব।

আমার ডাক পড়ল সবার শেষে। যে ঘরে ইন্টারভিউ হচ্ছে সেটাই দেখলাম স্টুডিও, কারণ একদিকে রয়েছে বেশ বড় একটা কাঁচের জানলা, ঘরের একপাশে একটা ইজেল আর তার পাশে একটা টেবিলের উপর আঁকার সরঞ্জাম। এইসবের মধ্যেই একটা ডেস্ক পাতা হয়েছে, আর তার দুদিকে দুটো চেয়ার। একটায় বসেছেন মার্তন্ড সাহেব। সাহেব কথাটা ভুল হল না, কারণ ভদ্রলোকের ইংরিজিটা বেশ চোস্ত। শকুনিমার্কা নাক, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, মাথার লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল নেমে এসেছে কাঁধ অবধি। পোশাক সম্ভবত নিজেরই ডিজাইন করা, কারণ জাপানী, সাহেবী আর মুসলমানী পোশাকের এমন খিচুড়ি আর দেখিনি। পাঁচ মিনিট কথা বলে আর জামা খুলিয়ে আমার বাইসেপ ট্রাইসেপ আর ছাতি দেখে ভদ্রলোক আমাকেই সিলেক্ট করে নিলেন। ডেইলি সিটিং-এ একশো টাকা। অর্থাৎ মাসে ত্রিশ দিন কাজ হলে তিন হাজার—আজকের দিনে প্রায় দশ-পনেরো হাজারের সামিল।

পরের দিন থেকেই কাজ শুরু হয়ে গেল। যে কোনো পৌরাণিক ঘটনাই হোক না কেন, তাতে প্রধান পুরুষ চরিত্র হব আমি। নারী চরিত্রের জন্য আছেন মিসেস

মার্তণ্ড, আর ওঁদেরই উনিশ বছরের মেয়ে শকুন্তলা। খুচরো পুরুষের জন্য মডেলের অভাব নেই। মার্তণ্ডের পৌরাণিক পোশাকের স্টক বিরাট—পাগড়ি মুকুট ধুতি চাদর কোমরবন্ধ তাগা তাবিজ নেকলেস সবই আছে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ দিয়ে আঁকা শুরু হল, তার জন্য একটি জবরদস্ত ধনুকও তৈরি করিয়ে রেখেছেন আর্টিস্ট মশাই।

হুসেন সাগর লেক থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে দেড়শ টাকা ভাড়ার দুটি ঘর নিয়ে নিলাম আমি। বাড়িওয়ালা মোতালেফ হোসেন অতি সজ্জন ব্যক্তি, বাঙালীদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা। রোজ সকালে আণ্ডা-টোস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি, নটা থেকে একটা পর্যন্ত সিটিং, তার মধ্যে চা-পানের জন্য দশ মিনিটের বিরতি থাকে এগারোটায়। কাজের পর বাকি দিনটা ফ্রী থাকে, হায়দ্রাবাদ শহর ঘুরে দেখি, সন্ধ্যাবেলা লেকের ধারে একটু বেড়িয়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। এছাড়া আরেকটা কাজ আছে, সেটা হল পুরাণের গল্প পড়ে মার্তণ্ডর জন্য সুটেব্‌ল সাবজেক্ট খুঁজে রাখা। মার্তণ্ড নিজে শুধু রামায়ণ-মহাভারতটা পড়েছেন, তাও তেমন খুঁটিয়ে নয়, তাই তাঁর বিষয়গুলো একটু মামুলি হয়ে পড়ে।

আমিই মার্তণ্ডকে বলেছিলাম রাজা বিক্রমাদিত্যের কিছু ঘটনা, যেগুলো ওঁর মনে ধরেছিল। আমি জানতুম বিক্রমাদিত্যের পক্ষে আমার চেহারা খুব যুৎসই। কিন্তু কাজের বেলা গণ্ডগোলটা কোথায় হল আর কী ভাবে হল সেটাই বলি।

চার মাস একটানা সিটিং দিয়ে আটটা ছবি হয়ে গেছে, এমন সময় একদিন সন্ধেবেলা লেকের ধারে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি, একটা পুরানো মসজিদের পাশ দিয়ে রাস্তা, জায়গাটা নিরিবিলি। মসজিদের উল্টো দিকে একটা তেঁতুল গাছের নিচে পোঁছেছি, এমন সময় পিছন দিক থেকে মাথায় একটা বাড়ি খেয়ে চোখে ফুলঝুরি দেখলুম।

জ্ঞান হলে পর দেখি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি, মাথায় আর বাঁ হাতে বেদম পেন। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে এক সহৃদয় ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে তুলে সোজা হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। হাতের ব্যথাটা আর কিছুই না—যখন পড়েছি তখন রাস্তায় একখণ্ড পাথর লেগে কনুইটা ফ্র্যাকচার হয়েছে। এখানে বলে রাখি যে অজ্ঞান অবস্থায় আমার বেশ কিছু লোকসান হয়ে গেছে ; আমার ওয়ালেটে ছিল দেড়শো টাকা, সেটি গেছে, আর আমার সাতশো টাকা দামের সাধের ওমেগা ঘড়িটা। পুলিশে খবর দিয়ে কোনো ফল হয়নি, কারণ এ ধরনের অঘটন রাস্তাঘাটে নাকি প্রায়ই ঘটে।

হাত প্লাস্টার করে বিছানায় পড়ে থাকতে হল তিন হপ্তা। জখম হবার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি মার্তণ্ডকে একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিয়েছিলুম আমার অবস্থা জানিয়ে। তিন দিনের মধ্যেই তার উত্তর এসে যায়। দুঃসংবাদ।

মার্তণ্ড লিখেছেন বিক্রমাদিত্য সিরিজের জন্য অর্ডার পেয়ে গেছেন, অমুক তারিখের মধ্যে ছখানা ছবি দিতে হবে, তাই তিনি অন্য মডেল নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমার মতো কোয়ালিফিকেশন নাকি তাঁর নেই, কিন্তু নিরুপায়। এ সিরিজ শেষ হলে পরে প্রয়োজন হলে আমায় আবার জানাবেন, ইত্যাদি।

এ নিয়ে তোআর করার কিছু নেই, তাই অগত্যা সময় কাটানো এবং যা হোক কিছু রোজগারের জন্য অন্ধ্র হেরাল্ড পত্রিকায় একটু আধটু লিখতে শুরু করলুম। ছখানা ছবি আঁকতে মার্তণ্ডের লাগবে অন্তত তিন মাস। অর্থাৎ আমার প্রায় ন হাজার টাকা লোকসান করে দিয়েছে হায়দ্রাবাদের গুণ্ডা।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই আমার বাড়িওয়ালার কাছে টেলিফোন এল মার্তণ্ড সাহেবের। আমায় নাকি তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

বেশ কৌতূহল নিয়ে হাজির হলুম মার্তণ্ডের স্টুডিওতে। ব্যাপারটা কী ?

'আমার একটা ভালো স্কেলিটন জোগাড় করে দিতে পার ?' বললেন মার্তণ্ড সাহেব। 'দু-একজনকে বলে ফল হয়নি তাই তোমার কথা মনে হল। যদি পার তো ভালো কমিশন দেব। আমার বিশেষ দরকার।'

জিগ্যেস করলুম স্কেলিটনের প্রয়োজন হচ্ছে কেন। মার্তণ্ড বললেন বেতাল পঞ্চবিংশতির ছবি আঁকবেন। বিক্রমাদিত্যের কাঁধে বেতাল হবে ছবির সাবজেক্ট। বেতালের গল্প আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়ে কিনা জানি না ; আমরা এককালে খুব উপভোগ করতুম। এক সন্ন্যাসী বিক্রমাদিত্যকে আদেশ করেছে—দু ক্রোশ দূরে শ্মশানে শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝুলছে, সেইটে তুমি আমার কাছে এনে দাও। বিক্রমাদিত্য শ্মাশানে গিয়ে ঝুলন্ত মড়ার গলার দড়ি তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেলতেই মড়া মাটিতে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। ছেলেবেলায় জিন্দা লাশ বলে একটা হিন্দি ফিল্ম দেখেছিলুম ; এও হল জিন্দা লাশ। এমন লাশ যার মধ্যে ভূত বাসা বেঁধেছে। এই ভূতে পাওয়া মড়াকেই বলে বেতাল। বিক্রমাদিত্য বেতালকে কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে চলেছেন, আর বেতাল তাঁকে হেঁয়ালি গল্প বলছে। রাজা যদি হেঁয়ালির ঠিক উত্তর দেন তাহলে মড়া আবার তাঁর কাঁধ থেকে শিরীষ গাছে ফিরে যাবে, আর যদি ভুল উত্তর দেন তাহলে রাজা বুক ফেটে মরে যাবেন।

যাই হোক, আমি মার্তণ্ডকে বললুম, 'কিন্তু সাহেব, বেতাল তো কঙ্কাল নয়, সে তো শবদেহ।'

মার্তণ্ড বললেন, 'স্কেলিটন পেলে আমি ছবিতে তার গায়ে চামড়া বসিয়ে নিতে পারব, কিন্তু স্কেলিটন আমার চাই-ই।'

আমি বললুম, 'তোমার মডেল কঙ্কালকে কাঁধে নিতে রাজি হবে তো?'

'হবে বৈকি,' বললেন মার্তণ্ড। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলে তার

কোনো ভয়ডর নেই। এখন তুমি বল তুমি জোগাড় করে দিতে পারবে কিনা।'

বললুম, 'আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট। তবে এ কিন্তু অল্প খরচে হবে না। আর কাজ হয়ে গেলে সে কঙ্কাল ফেরত দিতে হতে পারে।'

মার্তণ্ড আমার হাতে দু হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'এই হল কঙ্কালের সাতদিনের ভাড়া, এটা দাম নয়। আর তোমায় আমি দেব টু হান্ড্রেড।'

॥ ২ ॥

স্কেলিটন পাওয়া আজকের দিনে খুবই কঠিন সেটা সকলেই জানে। যা পাওয়া যায় সবই প্রায় বিদেশে এক্সপোর্ট হয়ে যায়। কিন্তু তখনও যে সহজ ছিল তা নয়। বিশেষত হায়দ্রাবাদের মতো জায়গায়। আমি অনর্থক খোঁজাখুঁজি না করে সোজা আমার বাড়িওয়ালাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। মোতালেফ সাহেব হায়দ্রাবাদে রয়েছেন বেয়াল্লিশ বছর। এখানকার নাড়ীনক্ষত্র জানেন। আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বললেন, 'একটা স্কেলিটনের কথা মনে পড়ছে বটে, তবে সেটা আসল কঙ্কাল না যন্ত্রপাতি লাগানো আর্টিফিশিয়াল কঙ্কাল সেটা বলতে পারব না। আর সেটা এখনো সে লোকের কাছে আছে কিনা তাও জানি না।'

'কে লোক সে ?'

'এক ম্যাজিশিয়ান,' বললেন হোসেন সাহেব। 'আসল নাম কী জানি না, তবে ভোজরাজ নামে খেলা দেখাত। তার মধ্যে একটা ছিল কঙ্কালের খেলা। কঙ্কাল তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খেত, তাস খেলত, দুজনে পাশাপাশি হাঁটাচলা করত। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। খুব নাম করেছিল লোকটা। তবে বছর পনেরো তার কোনো হদিস পাইনি। ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছে এটাই শুনেছিলাম।'

'সে কি হায়দ্রাবাদেরই লোক ?'

'হ্যাঁ, তবে তার ঠিকানা জানি না। অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশনে জিগ্যেস করে দেখতে পার। তারা ফি বছর ভোজরাজের খেলার ব্যবস্থা করত।'

অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে ভোজরাজের এককালের ঠিকানা পাওয়া গেল। আশ্চর্য ! গিয়ে দেখি লোকটা এখনো সেইখানেই আছে। চক বাজারের মধ্যে একটা দোতলা বাড়িতে দুটি ঘর নিয়ে তিনি থাকেন। বয়স আশি-টাশি হবে, মুখ ভর্তি একরাশ খয়েরি রঙের দাড়ি, মাথায় চক্চকে টাক, গায়ের রং আবলুশ। আমায় দেখে হিন্দিতে প্রথম কথাই বললেন, 'বাঙালী বাবুর নসীব খারাপ যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ?'

লোকটা তাহলে বোধহয় গুণতে জানে। এবারে আর ভনিতা না করে আসল ব্যাপারটা তাঁর কাছে পেশ করলুম। বললুম, 'যদি সে-কঙ্কাল এখনো আপনার

কাছে থেকে থাকে আর যদি সেটাকে হপ্তা খানেকের জন্য ভাড়া দিতে পারেন তাহলে আমার নসীব কিছুটা ইমপ্রুভ করতে পারে। যিনি ভাড়া নেবেন তিনি দু হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন। সে কঙ্কাল এখনো আছে কি ?'

'একটা কেন—দুটো আছে— হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!'

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলুম।

'আরে কঙ্কালতো তোমারও আছে!' বললেন ভোজরাজ। 'নেই কি ? কঙ্কাল আছে বলেইতো চলে ফিরে বেড়াচ্ছ! তোমার কঙ্কালতো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কনুইয়ের কাছে হাড়ে চিড় ধরল, ডাক্তার আবার সেটাকে জুড়ে দিল। তুমি জোয়ান বলেই জোড়া লাগল! আমি যদি মাথায় বাড়ি খেয়ে পড়ে হাড় ভাঙতুম, আমাকে কি আর কোনোদিন উঠতে হত ?'

এই সুযোগে একটা প্রশ্ন না করে পারলুম না।

'আমায় কে জখম করল সেটা বলতে পারেন ?'

'এ ভেরি অর্ডিনারি গুন্ডা,' বললেন ভোজরাজ। 'তবে তার পিছনে অন্য কেউ আছে কিনা জানি না। থাকতে পারে। সেটা জানতে পারে আমার কঙ্কাল। সেটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী। তুমি চাইছ সে কঙ্কাল, আমি দিতেও প্রস্তুত আছি—অনেককাল রোজগার নেই, দেনা জমে গেছে বিস্তর, দু হাজার পেলে সব শোধ হয়ে যাবে, আমিও নিশ্চিন্তে মরতে পাবি—কিন্তু একটা কথা বলি তোমায়। এ কঙ্কাল যে-সে কঙ্কাল নয়। যাঁর কঙ্কাল তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। মাটি থেকে পাঁচ হাত শূন্যে উঠে যোগ সাধনা করতেন। বায়ু থেকে আহার্য আহরণ করতেন, ফলমূলের দরকার হত না। তাঁর তেজ ছিল অসামান্য। একবার তাঁর সাধনার সময় এক চোর তাঁর কুটিরে ঢুকে ঘটিবাটি সরাতে গিয়েছিল। হাত বাড়ানো মাত্র আঙুলগুলো বেঁকে যায়। কুষ্ঠ। কেউটে ছোবল মারতে এলে সাপ ভস্ম হয়ে যেত, বাবাজীর কিছু হত না!'

আমি একটা কথা না বলে পারলুম না।

'কিন্তু এই বাবাজীর কঙ্কালকেও তো আপনি বশে এনেছিলেন। একে দিয়ে ভেলকি দেখাতেন স্টেজে।'

'তাহলে বলি শোন,' বললেন ভোজরাজ। 'কঙ্কালকে আমি কোনোদিন বশে আনিনি। এ সবই তাঁর খেলা। অন্য যা ম্যাজিক দেখাতুম সেগুলো কিছুই না—সব যন্ত্রপাতির কারসাজি। লোকে ভাবত কঙ্কালের মধ্যে বুঝি কলকব্জা আছে। আসলে কঙ্কালের যা কিছু ক্ষমতা সবই গুরুজীর কৃপায়। মনে মনে তাঁর শিষ্য হয়ে আমি একটানা দশ বছর তাঁর পদসেবা করি। তখন আমার তরুণ বয়স—ম্যাজিক সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল, এই পর্যন্ত। গুরুজী একবারও আমার কোনো নোটিস নেননি। তারপর একদিন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে

বললেন, 'বেটা, তোর ওপর আমি খুশি হয়েছি। তবে তুই এখন সংসার ত্যাগ করতে যাসনি। তোর অনেক কাজ আছে। তুই হবি ভোজবাজির রাজা। তোর নাম হবে। যে কাজে নাম করবি সেই কাজেই আমি তোকে সাহায্য করব, তোর সেবার প্রতিদান দেব। তবে সেটা এখন নয়। আমি মরার পর।'

আমি বললাম, 'সেটা কি রকম করে হবে যদি বুঝিয়ে দেন।'

গুরুজী আমাকে সন তারিখ বলে দিয়ে বললেন, 'এই দিনে যাবি তুই নর্মদার তীরে মান্ধাতা শহরে। সেখানে শ্মশানে গিয়ে দেখবি একটা বেল গাছ। সেই গাছ থেকে নদীর ধারে পশ্চিমে চলে যাবি নশো নিরানব্বুই পা। সেখানে দেখবি বনের মধ্যে একটা তেঁতুল গাছ আর বাবুল গাছের মধ্যে আকন্দ ঝোপের পাশে একটা কঙ্কাল। সেটাই আমি। সেটাকে তুই নিয়ে যাস। সেটাই সাহায্য করবে তোর কাজে, তোর আদেশ মানবে, লোকে দেখে তোকে বাহবা দেবে। তারপর কাজ ফুরিয়ে গেলে সেটাকে নদীর জলে ফেলে দিবি। যদি তখনও কাজ বাকি থাকে তাহলে সেটা জলে ডুববে না। তখন আবার তুলে এনে তোর কাছে রেখে দিবি।'

সব শুনেটুনে ভোজরাজকে জিগ্যেস করলাম, 'ওটা জলে ফেলে দেবার সময় কি এখনো আসেনি ?'

ভোজরাজ বললেন, 'না, আসেনি। একবার মুসির জলে ফেলে দেখেছিলাম, ডোবেনি। এখন বুঝতে পারছি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। তোমার কর্কট রাশিতে জন্ম তো?'

'হ্যাঁ।'

'পঞ্চমী তিথি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে তুমিই সেই লোক। অবিশ্যি রাশি আর তিথি না মিললেও, তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল তুমি সিধে লোক। বাবার কঙ্কালের হিল্লেটা তোমার হাত দিয়ে হলে ভালোই হবে। আমার বিশ্বাস বাবারও তোমাকে ভালো লাগত। তিনি সাচ্চা লোক পছন্দ করতেন।'

'তাহলে এখন কী করতে হবে ?'

'আগে ওই বাক্সটা খোলো।'

ঘরের এক পাশে একটা বড় কাঠের সিন্দুকের দিকে দেখিয়েছেন ভোজরাজ। আমি গিয়ে ডালাটা তুললুম। ভেতরে কিংখাবের কাজ করা একটা গাঢ় লাল মখমলের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে কঙ্কালটা শোয়ানো রয়েছে। ভোজরাজ বললেন, 'ওটাকে তুলে বাইরে আন।'

দেখলাম মিহি তামার তার দিয়ে সুন্দর করে কঙ্কালের হাড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে প্যাঁচানো রয়েছে। পাঁজরটা দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে কঙ্কালটা বাইরে

আনলুম। ভোজরাজ বললেন, 'ওটাকে দাঁড় করাও।'

করালুম।

'এবার হাত দুটো ছেড়ে দাও।'

হাত সরিয়ে আনলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ টেরিয়ে গেল। কঙ্কাল নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো সাপোর্ট নেই।

'এবারে ওটাকে গড় কর। এই শেষ কাজের জন্য ওটা তোমারই সম্পত্তি।'

কাজটা যে কী জানি না, তবু রিস্ক না নিয়ে গড় না করে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়লুম স্কেলিটনের সামনে।

'যা করছ তা বিশ্বাস করে করছ তো?' জিগ্যেস করলেন ভোজরাজ। বললুম, 'আমার মনের সব কপাট খোলা, ভোজরাজজী। আমি হাঁচি টিকটিকি ভূত-প্রেত দত্যি-দানা বেদ-বেদান্ত আইনস্টাইন-ফাইনস্টাইন সব মানি।'

'ভেরি গুড। এবার তুমি ওটাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। দেখো যেন গুরুজীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কাজ হয়ে গেলে ওটাকে মুসি নদীর জলে ফেলে দিও।'

কঙ্কাল পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে মার্তণ্ড আমাকে দুশোর জায়গায় পাঁচশো টাকা বকশিস দিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কী করছ?'

'কেন বলুন তো?'

'আজ বিক্রমাদিত্যের ছবিটা আঁকা শুরু করব। তুমি এলে ভালো হয়।'

'আমি তো জানতুম আপনি সকালে ছাড়া ছবি আঁকেন না।'

'এটার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা,' বললেন মার্তণ্ড। 'এ ছবির জন্য যে মুডটা চাই সেটা রাত্রেই ভালো আসবে। আর দৃশ্যটার জন্য আমি নিজে প্ল্যান করে একটা লাইটিং-এর ব্যবস্থা করেছি। আমি সেটা তোমাকে দেখাতে চাই।'

'কিন্তু মডেল যদি আপত্তি করে?'

'তুমি যে ঘরে আছ সেটা সে জানবেই না। তুমি ঠিক সাতটার সময় এসে স্টুডিওর এই কোণটাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আলোগুলো সব মডেলের উপর ফেলা থাকবে। তার পিছনে কী আছে সেটা সে দেখতেই পাবে না।'

এককালে অ্যামেচার থিয়েটার করেছি। জানতুম ফুটলাইটের পিছনে দর্শকদের প্রায় দেখাই যায় না। এও সেই ব্যাপার আর কী।

আমি রাজি হয়ে গেলাম।

একটা ধুকপুকুনির ভাব নিয়ে সাতটার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে হাজির হলুম মার্তণ্ডের বাড়ি। ওঁর মাদ্রাজী চাকর শিবশরণ আমাকে দরজা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিলে স্টুডিওতে।

মডেলের জায়গা এখনো খালি। তবে লাইটিং হয়ে গেছে এবং সত্যিই তারিফ করার মতো ব্যাপার সেটা। যে শ্মশানে ভূত পিশাচের নৃত্য হচ্ছে সেখানে এইরকম আলোরই দরকার।

মার্তণ্ড বসে আছেন ক্যানভাসের সামনে, তার পাশে একটা জোরালো ল্যাম্প। সে আমাকে আড়চোখে দেখে একটা বিশেষ দিকে নির্দেশ করল। সেটা হল স্টুডিওর সঙ্গে লাগা একটা ঘরের দরজা। বুঝলাম সে ঘরে মডেল তৈরি হচ্ছেন।

এবারে আরেকটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি গেল। সেটা হল কঙ্কাল। একটা হ্যাটস্ট্যান্ডের ডাঁটি থেকে সেটা ঝুলছে। তার গায়ে ভৌতিক আলো পড়ে সেটা আরো ভৌতিক দেখাচ্ছে। আর তার সঙ্গে ভৌতিক হাসি। তোরা লক্ষ করেছিস কিনা জানি না—বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে থাকে বলে যে-কোনো খুলির দিকে চাইলেই মনে হয় সেটা হাসছে।

একটা খুট্ শব্দ শুনে অন্য ঘরের দরজাটার দিকে চোখ গেল। তলোয়ার হাতে রাজপোশাক পরিহিত বিক্রমাদিত্য বেরিয়ে এলেন দরজা খুলে। পাকানো গোঁফ, গালপাট্টা, লম্বা ঢেউ খেলানো চুল—কোনো ভুল নেই। মনটা হু হু করে উঠল, কারণ এই পার্টটা আমারই পাবার কথা, দৈব দুর্বিপাকে ফস্‌কে গেল।

রাজা এসে স্টেজে আলো নিয়ে দাঁড়ালেন। মার্তণ্ড উঠে গিয়ে তার পোজ আর পোজিশনটা ঠিক করে দিয়ে চলে গেলেন হ্যাটস্ট্যান্ডের দিকে। কঙ্কালটাকে নামিয়ে নিয়ে সেটাকে মডেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটার হাত দুটোকে তোমার কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দাও, আর পা দুটো কোমরের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এক করে তোমার বাঁ হাত দিয়ে চেপে থাক।'

দেখলুম মডেল দিব্যি মার্তণ্ডের ইনস্ট্রাকশন পালন করলেন। লোকটার সাহসের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

মার্তণ্ড ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন। প্রথমে চারকোল দিয়ে স্কেচটা করে তারপর রং চাপানো হবে। এর আগে তো আমিই মডেল হতুম, তাই আঁকাটা কেমন হচ্ছে সেটা দেখার সুযোগ ছিল না। আজ দেখতে পেলুম মার্তণ্ডের নিপুণ হাতের কাজ।

মিনিট পাঁচেকও হয়নি, হঠাৎ মনে হল স্টেজের দিক থেকে একটা গোঙানির শব্দ পাচ্ছি। আর্টিস্ট এত মশগুল যে তাঁর কানে শব্দটা যায়নি। তিনি খালি বললেন, 'স্টেডি, স্টেডি,' কারণ রাজা অল্প অল্প হেলতে দুলতে শুরু করেছেন।

আর্টিস্টের আদেশ সত্ত্বেও দেখলাম মডেল স্টেডি থাকতে পারছেন না, তিনি এপাশ ওপাশ করছেন। আর তাঁর মুখ দিয়ে যে শব্দটা বেরোচ্ছে সেটাকে গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

'হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার?' বেশ বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মার্তণ্ড।

এদিকে আমি ম্যাটারটা বুঝে ফেলেছি। কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কী ঘটছে।

কঙ্কালের হাত দুটো আর ঝোলানো নেই। সেটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে মডেলের থুতনির নিচে এসে ক্রমে একটা ভয়ংকর আলিঙ্গনে পরিণত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পা দুটোও যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছে কোমরটাকে, সেটা আর কোনোদিন খোলা যাবে বলে মনে হয় না।

মডেলের অবস্থা এখন শোচনীয়। তাঁর গোঙানি ক্রমে পরিত্রাহি আর্তনাদে পরিণত হয়েছে, আর তিনি তলোয়ার মাটিতে ফেলে দিয়ে সমস্ত দেহটাকে ঝাঁকিয়ে দু'হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে কঙ্কালের হাত দুটো আলগা করার চেষ্টা করছেন।

মার্তণ্ড একটা চিৎকার দিয়ে দৌড়ে গেছেন মডেলের দিকে, কিন্তু দু'জনের কম্বাইন্ড চেষ্টা এবং শক্তিপ্রয়োগেও কোনোই ফল হল না। মার্তণ্ড হাল ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে এসে ইজেলটাকে উল্টে ফেলে দিয়ে আমারই পাশে দেওয়ালের গায়ে এলিয়ে পড়লেন।

আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা যদিও বেশিক্ষণ থাকেনি, কিন্তু তার মধ্যেই মডেল কাঁধে কঙ্কাল সমেত মাটিতে গড়িয়ে পড়েছেন এদিকে ঘড়ঘড়ে গলায় মার্তণ্ড বলছেন, 'ডু সামথিং!'

আমি এবার এগিয়ে গেলুম মঞ্চের দিকে। আমার কিন্তু ভয় কেটে গেছে এর মধ্যেই, কারণ মন বলছে কঙ্কাল আমার কোনো ক্ষতি করবে না, আমার চেষ্টায় কোনো বাধা দেবে না।

কাছে যেতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মাথাটা ভোঁ করে উঠল। রাজার চুল গোঁফ গালপাট্টা পাগড়ি সবই আলগা হয়ে খসে পড়েছে, আর তার ফলে যে মুখটা বেরিয়ে পড়েছে সেটা আমার চেনা।

ইনি হলেন মার-খাওয়া ফিল্মের হিরো বিশ্বনাথ সোলাঙ্কি।

মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গিয়ে জাজ্জ্বল্যমান সত্যিটা বেরিয়ে পড়ল, আর সেই সঙ্গে মাথায় খেলে গেল এক পৈশাচিক বুদ্ধি।

আমি সোলাঙ্কির উপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'এবার বল তো দেখি, আমার জায়গাটা দখল করার জন্য আমার মাথায় বাড়ি তুমিই মারিয়েছিলে কিনা। না বললে কিন্তু কঙ্কালের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই।'

সোলাঙ্কির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে; সে সেই অবস্থাতেই দম বেরিয়ে আসা গলায় বলে উঠল, 'ইয়েস ইয়েস ইয়েস—প্লীজ সেভ মি, প্লীজ!'

আমি মার্তণ্ডের দিকে ফিরে বললুম, 'তুমি সাক্ষী। শুনলে তো?'—কারণ এঁকে আমি পুলিশে দেব।'

মার্তন্ড মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

এবার কঙ্কালের কাঁধ ধরে মৃদু টান দিতেই সেটা রাজার কাঁধ ছেড়ে উঠে এল, সঙ্গে সঙ্গে কোমর ছেড়ে পা দুটোও।

এর পরে অবিশ্যি সোলাঙ্কি মশাইয়ের আর মডেল হওয়া হয়নি, কারণ তাকে বেশ কিছুদিন পুলিশের জিম্মায় থাকতে হয়েছিল। তার জায়গায় বিক্রমাদিত্য সিরিজের হিরো হলেন তারিণীচরণ বাঁড়ুজ্যে। ঘটনাটা মার্তণ্ডকে কাবু করে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দিন সাতেকের মধ্যেই রিকভার করে তিনি আবার পুরোদমে কাজে লেগে গেলেন।

বেতালের ছবি শেষ হবার পর দিনই মুসি নদীর জলে কঙ্কালটাকে ফেলে দিলাম। চোখের নিমেষে সেটা তলিয়ে গেল জলের তলায়।